প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর, ১৯৫৮
অগ্রহায়ণ, ১৩৬৫

প্রকাশ করেছেন
অমিয়কুমার চক্রবর্তী
অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির
৬, বঙ্কিম চ্যাটুজ্জে স্ট্রীট
কলকাতা১-২
ছেপেছেন
এন, সাহা
গ্রন্থবাণী প্রেস
৫০, আমহার্স্ট
কলিকাতা-৯
প্রচ্ছদ এঁকেছেন
গণেশ বসু
২·৫০

পাপ্পা, কুশ এবং গুলুকে—

জুল ভার্নের (১৮২৮—১৯০৫) এই উপন্যাসটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ সালে ; তার আগেই বেরিয়ে গেছে 'ফাইভ উইকস ইন এ বেলুন' (১৮৫৯)—তাঁর প্রথম বিখ্যাত উপন্যাস— আর ১৮৬৯ সালে বেরিয়েছে 'টোয়েন্টি থাউজ্যাণ্ড লীগস আণ্ডার দি সী'—যা নাকি তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। 'এরাউণ্ড দি ওয়ার্ল্ড ইন এইটি ডেজ' তাঁর অসাধারণ প্রতিভার আর-একটি নিদর্শন—প্রথম প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গেই চারটে ভাষায় তার তর্জমা বেরিয়ে যায়।

বিজ্ঞানের মূল সূত্রের সঙ্গে কাল্পনিক অভিযান ও অ্যাডভেঞ্চার মিশিয়ে তিনি যে-সব উপন্যাস রচনা করেছিলেন, তাদের মধ্যে এটি বোধকরি সবচেয়ে রুদ্ধশ্বাস ও উত্তেজনাসংকুল। অন্তত একবার পড়তে শুরু ক'রলে শেষ না ক'রে আর ছাড়া যায় না।

এই উপন্যাসটি অনুবাদ করেছেন মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি এর আগে জুল ভার্নের অন্যান্য উপন্যাস অনুবাদ ক'রে খ্যাতি পেয়েছেন। এই অনুবাদটিও সরল, প্রাঞ্জল ও বিশ্বস্ত ব'লে অল্পদিনের মধ্যেই নিঃশেষিত হ'য়ে যায়। দ্বিতীয় সংস্করণে অল্পবিস্তর পরিমার্জনার ফলে অনুবাদ আরো ত্রুটিহীন হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

প্রকাশক

বাগ্মী হিশেবে পৃথিবী-জোড়া নাম হয়েছিলো শেরিডানের। আঠারো শতকের গোড়ার দিকে যে-বাড়িতে তাঁর জীবনান্ত ঘটেছিলো, আঠারো শতকের শেষের দিকে সেই বাড়িতেই থাকতেন রিফর্ম ক্লাবের সভ্য ফিলিয়াস ফগ।

ফগের টাকাকড়ি ছিলো অঢেল, কিন্তু কী ভাবে তিনি টাকা রোজগার করতেন, সে এক মহা রহস্য। রিফর্ম ক্লাবের মেম্বার হিশেবেই ওঁকে জানতো সকলে, কাজ-কারবার কোনো কিছু করতে কেউ ছাখেনি ওঁকে,—অথচ টাকা ছিলো ওঁর অঢেল। ফগ কথা বলতেন কম, খরচ করতেন কম, আর ওঁর সংযম ছিলো সে-এলাকার সকলের আদর্শ। অথচ, কিপ্টেও ওঁকে বলা চলে না, কেননা ওঁর দানের পরিমাণ ছিলো প্রচুর। বিলাসিতা জিনিশটা অসহ্য ছিলো ফগের কাছে। কিন্তু, ওঁর সম্পর্কে যে-কথা সব-আগে বলবার, তা হ'লো, ওঁর সাংসারিক কাজকর্ম চলতো ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায়,—এক সেকেণ্ড এদিক-ওদিক হ'লেই বাধতো কুরুক্ষেত্র।

ভূগোল ছিলো ফগের নখদর্পণে। আর তাই অনেকেই মনে করতো অনেক দেশ-বিদেশ ঘুরে এসেছেন উনি। কিন্তু, আশ্চর্য ব্যাপার,—লণ্ডনের একচুল বাইরে কখনো পদার্পণও করেননি উনি। নিজের বাড়ি, আর রিফর্ম ক্লাব—এই ছু-জায়গা ছাড়া ফগ আর কোথাও যাননি কখনো।

বাজি রেখে তাস খেলা ছাড়া আর কোন নেশা ছিলো না ফগের। ক্লাব-ঘরে ব'সে খবর-কাগজ পড়া আর বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে তাস খেলা ছাড়া আর কিছু তিনি জানতেন না যেন। তাস খেলায় ওঁকে কেউ হারতে দেখেছে ব'লে মনে হয় না। বাজির টাকা নিজে

না নিয়ে ফগ দান করতেন, কাজেই এ কথা বলা বাহুল্য যে টাকার লোভে তিনি তাস খেলতেন না। হুইস্ট খেলায় মাথা লাগে ব'লেই বোধহয় হুইস্ট খেলায় ফগের জুড়ি ছিলো না।

আপন বলতে দুনিয়ায় ফগের কেউ ছিলো না; সেভিল্‌রোর সেই নির্জন বাড়িতে একাই থাকতেন। বাড়িতে ফগের সঙ্গে দেখা করতে কেউ কখনো গেছে ব'লে কোন নজির পাওয়া যায় না। রিফর্ম ক্লাবে প্রত্যহ একলাই আহার করতেন উনি,—ওঁর সঙ্গে এক টেবলে বসে খেতে কাউকে কখনো দেখা যায় নি। ক্লাবের ওয়েটাররা খুব সতর্ক হ'য়ে সার্ভ করতো ওঁকে। সবচেয়ে ভালো জিনিশ ছাড়া কিছুই যে ঠোঁটে ছোঁয়ান না উনি, সে কথা ওয়েটারদের ভালো ক'রেই জানা ছিলো।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র দশ ঘণ্টা থাকতেন উনি বাড়িতে, আর সেই দশ ঘণ্টা কাটতো ঘুমোতে ও পোশাক-আশাক পরতে। আড়ম্বর না-থাকলেও ওঁর বাড়িতে আরাম ছিলো। জেমস ছিলো ওঁর পরিচারক। প্রভুর মেজাজ বুঝে তাকেও ঠিক ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায় নির্দিষ্ট সময়ে কাজ করতে হ'তো। আমাদের কাহিনীর যবনিকা যেদিন উঠলো, সেদিন জেমস ফগকে দাড়ি কামাবার জন্যে যে গরম জল দিয়েছিলো তা ছিয়াশি ডিগ্রি না-হ'য়ে চুরাশি ডিগ্রি হওয়ায় সঙ্গে-সঙ্গে বরখাস্ত হ'য়ে গেলো সে।

ইজি-চেয়ারে ব'সে ফগ তাকিয়ে ছিলেন তাঁর ঘড়ির দিকে। ঘড়িটা, বলা বাহুল্য, সবচেয়ে ভালো জাতের। ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ড তো বটেই, বারের নাম, মাস, বছর পর্যন্ত পাওয়া যেতো ঐ ঘড়িতে। সাড়ে এগারোটা বাজে তখন। অন্যদিন এই সময়েই ক্লাবে যেতেন ফগ।

এমন সময় জেমস ঘরে ঢুকে জানালে, 'নতুন লোক এসেছে।'

সঙ্গে-সঙ্গে বছর ত্রিশের একজন ফরাশি ঘরে ঢুকলো। ফগ লোকটার দিকে তাকালেন: 'ফরাশি দেখছি! তোমার নামই জীন?'

'জীন নয়, জঁা—জঁা পাসপার্তু।' লোকটি বললো, 'আমার

ধারণা, লোক আমি খারাপ নই। এ-পর্যন্ত অনেক রকম কাজই করেছি আমি। কিছুদিন রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে বেড়িয়েছি। এক সার্কাসের দলেও ছিলাম কিছুকাল—ট্রাপিজের খেলায় তো রীতিমতো ওস্তাদ। এক কুস্তির আখড়ায়ও সর্দারি করেছি কিছুদিন। পারীর রেলে ফায়ারম্যানও ছিলাম কয়েক দিন। পাঁচ বছর হ'লো ফ্রান্স ছেড়েছি। ইংল্যাণ্ডে এক ভদ্রলোকের কাছে কাজ করেছিলাম কিছুকাল—কিন্তু শেষ অবধি তাঁর কাছে কাজ করা আর পোষালো না। এখন তাই বেকার ব'সে আছি। শুনলাম, আপনার একজন পরিচারক চাই। আরো শুনলাম, আপনি সংযমী আর সময়ানুবর্তী। আপনার কাছে সুখে-শান্তিতে থাকতে পারবো এই ভরশায় এসেছি।'

ফগ জবাব দিলেন, 'ঠিক আছে। তোমার সততার কথা আমি আগেই শুনেছি, সার্টিফিকেটগুলোও দেখেছি। এই চাকরির শর্তগুলো সব জানো তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বেশ। এখন কটা বেজেছে?'

পাসপার্তু তার জেব থেকে প্রকাণ্ড ঘড়ি বের করে বললে: 'এগারোটা বাইশ।'

'উঁহু। তোমার ঘড়ি ঠিক নয়—স্লো চলছে।'

'অসম্ভব।' পাসপার্তু প্রতিবাদ জানালো।

'তোমার ঘড়ি চার মিনিট স্লো চলছে। সে যাক, ভুলটা শুধরে নিলেই হ'লো। মনে রেখো, আঠারোশো বাহাত্তর সালের দোসরা অক্টোবর বেলা এগারোটা ছাব্বিশে তুমি আমার কাজে ভর্তি হ'লে।' বলতে-বলতে ইজি-চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ফগ, যন্ত্রের মতো টুপিটা মাথায় দিলেন, তারপর আর কিছু না ব'লে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

নতুন মনিবের সামনে দাঁড়িয়ে পাসপার্তু এতোক্ষণ তাঁর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করছিলো। সুন্দর কান্তি ফগের, লম্বা-চওড়া

শরীর। দেখলেই মনে হয়, ফগ এক কথার মানুষ। যারা ভালো ক'রে লক্ষ করেছিলো তারা জানতো, ফিলিয়াস ফগ কক্ষনো খামকা কোনো কাজ করতেন না। যেখানে এক-পা ফেললেই চলে, সেখানে কেউ তাঁকে দু-পা এগোতে দেখে নি। যে-পথে গেলে সবচেয়ে কম সময়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছোনো যায়, ফিলিয়াস ফগ সব সময় সেই পথেই পা বাড়াতেন। বাধা তাঁর কাছে বাধাই ছিলো না। যা ধরতেন, তা শেষ না করে ছাড়তেন না তিনি। খামকা কোনো কিছু করা অভ্যেস ছিলো না তাঁর। দুঃখে আনন্দে অবিচলিত, বিপদে অচঞ্চল, সদা শান্ত, ধীর স্থির ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ফগ এক আশ্চর্য-স্বভাব লোক ছিলেন। তাড়াহুড়ো ক'রে কিছু করতে কেউ তাঁকে কখনো দেখেনি। নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতেন, সাতে-পাঁচে রা করতেন না কোনো।

জাঁ পাসপার্তু মানুষ হিশেবে ভালোই। দৃঢ়গড়ন শরীর তার, মুখে একটা আশ্চর্য লাবণ্যের ছাপ। অনেক দিন অনেক রকম কাজ করতে-করতে ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলো—তাই, কিছুদিন শান্তিতে কাটানোর জন্যেই ফগের কাছে এসে চাকরি নিয়েছিলো সে।

পাসপার্তু তার ঘরকন্না দেখে নিতে লাগলো। দেখলো, যেখানে যা থাকা উচিত, এ-বাড়িতে তা ঠিকই আছে। কোথাও বিলাসিতার চিহ্নও নেই, অথচ অভাবও নেই কোনো। পাসপার্তু মনে-মনে খুশিই হ'লো। সবকিছু দেখে-শুনে ও নিজের ঘরে এসে হাজির হ'লো। ঘরটা ভালো। একদিকে টেলিফোন আর ইলেকট্রিক ঘড়ি টিক-টিক ক'রে চলছে। ফগের ঘরের ঘড়ি আর এই ঘড়ি ঠিক একই সময় রাখছিলো। ঘড়িটার পাশেই, দেয়ালে, একটা কাগজে পরিচারকের প্রাত্যহিক কাজের একটা রুটিন ঝুলছিলো। পাসপার্তু পড়তে লাগলো: আটটা তেইশ মিনিটে প্রাতরাশ, ন-টা সাঁইত্রিশ মিনিটে দাড়ি কামাবার জন্য গরম জল, পৌনে দশটার সময় স্নানের আয়োজন ইত্যাদি-ইত্যাদি।

পাসপার্তু তার কাজের রুটিনে মনঃসংযোগ করলো খুশি মনেই।

ক্লাবে পৌঁছেই ফগ কারো সঙ্গে কোনো কথা না-ব'লে নিজের খাবার টেবিলে গিয়ে বসলেন। বারোটা সাতচল্লিশ মিনিটের সময় খাওয়া শেষ ক'রে ড্রয়িংরুমে এসে পৌঁছোনো-মাত্র বেয়ারা তাঁর হাতে একটি 'টাইমস' কাগজ দিয়ে গেলো। 'টাইমস' আর তারপর 'স্ট্যাণ্ডার্ড' কাগজ পড়তে-পড়তেই লাঞ্চের সময় হ'য়ে গেলো। লাঞ্চ সেরে ফগ একটি 'মর্নিং ক্রনিকল' হাতে ক্লাবের সেলুনে ঢুকলেন।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর বন্ধু-বান্ধবে ঘরটা ভ'রে গেলো। এঁরা সবাই হুইস্টে এক-একজন নামজাদা খেলোয়াড়। আঁদ্রে স্টুআর্ট, জন সলিভান, স্যামুএল ফলেন্টিন, টমাস ফ্ল্যানাগেন, বিলেতের বড়ো একটা ব্যাংকের অন্যতম ডিরেক্টার গথিয়ার র‍্যালফ—এঁদের কারোই টাকার অভাব ছিলো না। ফিলিয়াস ফগের হুইস্ট-যুদ্ধ চলছে এঁদের সঙ্গেই।

ফায়ার-প্লেসের চারদিকে ব'সে এঁরা গল্প-গুজব করতে লাগলেন। ফ্ল্যানাগেন বললেন: 'র‍্যালফ, এই যে সাংঘাতিক ডাকাতিটা হ'য়ে গেলো, এর কিনারা কিছু হ'লো কি?'

স্টুআর্ট বললেন: 'কী আর হবে? ব্যাংকের টাকাগুলো মাঠে মারা গেলো আর কি!' স্টুআর্টের কথায় কান না দিয়েই র‍্যালফ বললেন, 'আমার ভরসা হচ্ছে ধরা পড়বে। আমেরিকা, য়ুরোপ, এশিয়া—সবখানেই আমাদের ডিটেকটিভ আছে। প্রত্যেক বড়ো-বড়ো বন্দরেই তারা খবর নিচ্ছে। এদের ফাঁকি দিয়ে পালানো খুব সহজ নয়।'

স্টুআর্ট বললেন: 'তাহ'লে চোরের চেহারা কেমন, আপনারা জানেন?'

কথা শুনে র‍্যালফ দৃঢ়স্বরে বললেন: 'চোর কেন বলছেন? টাকাটা যে নিয়েছে, সে চোর নয়।'

'সে কী!' স্টুআর্ট অবাক হ'লেন: 'সাড়ে আট লক্ষ টাকার নোট নিয়ে যে স'রে পড়তে পারে, সে চোর না-হ'লে কী?'

'না, চোর সে নয়।'

বিদ্রূপে ফেটে পড়লেন সলিভান: 'না না, সে কেন চোর হ'তে যাবে? সে হ'লো সেণ্ট পলের খাঁটি চেলা!'

খবরের কাগজ থেকে মাথা তুললেন ফগ। 'মর্নিং ক্রনিকলে পড়ছিলাম যিনি নোটগুলো নিয়েছেন, তিনি নাকি রীতিমতো ভদ্রলোক।'

আলোচনা চলতে লাগলো।

তিন দিন আগে ইংল্যাণ্ডের ব্যাংক থেকে সাড়ে আট লাখ টাকার নোট চুরি হয়েছিলো। ব্যাংকের অন্যতম ডিরেক্টর র‍্যালফ সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন: 'এই চুরির জন্যে ক্যাশিয়ার বেচারির কিন্তু কোনো দোষ নেই। ও কী করবে? ও তখন মন দিয়ে ব্যাংকের একটা পাওনা খাতায় জমা করছিলো। একটা লোক তো আর চারদিকে চোখ রাখতে পারে না!'

ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ডে যাঁরা টাকাকড়ি দিতে বা নিতে আসতেন কর্তৃপক্ষ তাঁদের সততা সম্পর্কে কখনোই কোনো সন্দেহ করেন নি। কেউ নোট দেখছেন, কেউ সোনা পরীক্ষা করছেন, কেউ বা হিরে-মুক্তো দেখছেন। পরীক্ষার পর সবাই আবার যথাস্থানে টাকাকড়ি রেখে দিতেন—এইভাবেই কাজ চলতো। কিন্তু সেদিন যিনি নোট নিয়েছিলেন তিনি আর তা ফেরৎ দিলেন না। বেলা পাঁচটার সময় যখন ব্যাংক বন্ধ করা হবে, তখনই প্রথম জানা গেলো যে, ব্যাংকের সাড়ে আট লাখ টাকা চুরি হয়েছে।

অমনি হৈ-চৈ শুরু হ'য়ে গেলো। চারদিকে ডিটেকটিভ পাঠানো হ'লো। দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়লো ঐ চুরির খবর। ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড ঘোষণা করলো, চোর ধরতে পারলে ত্রিশ হাজার টাকা পুরস্কার তো মিলবেই, তা ছাড়া অপহৃত টাকার যতটুকু পাওয়া

যাবে তার উপর শতকরা ত্রিশ টাকা হিশেবে কমিশন দেয়া হবে।

মর্নিং ক্রনিকল জানালো যে, ঘটনার দিনে ভদ্রবেশধারী, আচার ব্যবহারে সুমার্জিত একটি লোককে ব্যাংকের নোট পরীক্ষা করতে দেখা গিয়েছিলো। তার পোশাক ও চেহারার বর্ণনা ডিটেকটিভদের দেয়া হয়েছিলো ব'লেই কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস, চোর ধরা পড়বেই। খবরের কাগজগুলো তো হুজুগ পেলেই হৈ-চৈ করে, এবারো শোরগোল তুলতে ভোলে নি।

র‍্যালফের বিশ্বাস পুরস্কারের লোভে ডিটেকটিভরা নিশ্চয়ই প্রাণপণ চেষ্টা করবে,—তাহ'লে দস্যু ধরা পড়বেই। স্টুআর্টের মত ছিলো অন্যরকম। হুইস্ট খেলতে-খেলতে তাই তাঁরা এই জবর গরম খবরেরই আলোচনা করতে লাগলেন। স্টুআর্ট বললেন: 'চোর যে মহা ধুরন্ধর, তা বেশ বোঝাই যাচ্ছে। আমার বিশ্বাস, ও পালিয়ে যাবে।'

র‍্যালফ বললেন: 'পালাবে তো বটেই,—কিন্তু যাবে কোথায়, বলুন!'

'কেন? দুনিয়ায় কি জায়গার অভাব আছে নাকি? পৃথিবীটা তো আর এতটুকু নয়, পালাবার জায়গার আবার ভাবনা!'

ফিলিয়াস ফগ তাস শাফল করতে-করতে বললেন: 'এককালে পৃথিবীটা বড়োই ছিলো, এখন আর সে-দিন নেই।'

স্টুআর্ট বললেন: 'তার মানে? পৃথিবী কি এখন ছোটো হ'য়ে গেছে নাকি?'

র‍্যালফ বললেন: 'ঠিক তাই। একবার পৃথিবীটা ঘুরে আসতে এখন যে-সময় লাগে, আগে লাগতো তার দশগুণ বেশি। তবেই তো পৃথিবী ছোটো হ'য়ে গেলো। এইজন্যে চোরের সন্ধান খুব তাড়াতাড়ি হবে—সে আর পালাবে কোথায়?'

ফগ বললেন: মিস্টার স্টুআর্ট, এবার আপনার পালা, খেলুন।'

আর খেলা! স্টুআর্টের তখন খেলার দিকে মন ছিলো না।

'এখন তিন মাসে পৃথিবী ঘুরে আসা যায় ব'লে পৃথিবীটা এতই ছোটো হ'য়ে গেছে, আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে আছেন?'

ফগ বাধা দিলেন: 'তিন মাস তো ঢের বেশি—আশি দিনেই সারা দুনিয়া ঘুরে আসা যায়।'

সলিভান সায় দিলেন ফগের কথায়। 'এ-কথা ঠিক। রোটাস থেকে এলাহাবাদ অবধি গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলপথ খুলেছে। এখন আশি দিনেই সারা পৃথিবী ঘোরা হ'য়ে যায়। এই দেখুন না, মর্নিং ক্রনিকলে লিখেছে, মঁসেনিস ও ব্রিন্দিসি হ'য়ে রেল ও স্টীমারে লণ্ডন থেকে সুয়েজ সাত দিন: স্টীমারে সুয়েজ থেকে বোম্বাই তেরো দিন, রেলে বোম্বাই থেকে কলকাতা তিন দিন, স্টীমারে কলকাতা থেকে হংকং তেরো দিন; স্টীমারে হংকং থেকে ইয়োকোহামা ছয় দিন; স্টীমারে ইয়োকোহামা থেকে সানফ্রান্সিসকো বাইশ দিন; রেলে সানফ্রান্সিসকো থেকে নিউ ইঅর্ক সাত দিন, রেলে আর স্টীমারে নিউ ইঅর্ক থেকে লণ্ডন নয় দিন—একুনে আশি দিন।'

দিনের হিশেব কষতে-কষতে খেলার কথা ভুলে গিয়ে স্টুআর্ট একটা ভুল তাস খেলে ফেললেন: 'হ্যাঁ, আশি দিনই বটে। কিন্তু ঝড়-তুফান, জাহাজ-ডুবি, রেল-কলিশন—এ-সব তো আর ও হিশেবে ধরা হয়নি!'

ফগ বললেন: 'সে-সব ধ'রেই বৈকি।'

'বলেন কী?' স্টুআর্ট যেন অবাক হলেন একটু: 'সে-সব ধ'রেই? যদি আমেরিকার বুনোরা পথ থেকে রেল উঠিয়ে রাখে, কিংবা যদি ট্রেন থামিয়ে লুঠতরাজ শুরু করে তাহ'লে—'

শান্ত গলায় ফগ জবাব দিলেন: 'হ্যাঁ, তাহ'লেও।—এই দেখুন, আমার হাতে দুটো রং। এ-বাজি আমার।'

স্টুআর্ট বললেন: 'ওসব গাঁজাখুরি ব্যাপার কাগজেই মানায়, বাস্তবে—'

'বাস্তবেও ঐ হিশেব ঠিক।'

স্টুআর্ট হাসলেন: 'আপনিই একবার ক'রে দেখান না যে আশি দিনেও পৃথিবী ঘুরে আসা যায়!'

'চলুন না, আপনিও ঘুরে আসবেন আমার সঙ্গে।'

'উঃ রে ব্বাশ রে! এই অসম্ভব ব্যাপারে মাথা গলিয়ে নাকাল হ'তে চাইনে আমি। আপনি যদি আশি দিনেই পৃথিবী ঘুরে আসতে পারেন, তবে ষাট হাজার টাকা দেবো।'

'আশি দিনে পৃথিবী ঘুরে আসা—এই তো? বেশ আমিই যাবো।'

'কবে?'

'কেন? এক্ষুনিই রওনা হ'য়ে পড়বো। তবে, আগেই ব'লে রাখছি, সমস্ত খরচ কিন্তু আপনার।'

ফগের একগুঁয়েমি দেখে স্টুআর্ট একটু বিরক্ত হ'য়ে পড়লেন: 'এইসব বাজে কথা রেখে, আসুন তো, এক-হাত খেলা যাক ভালো ক'রে!

'আগের বাজি আপনি হেরেছিলেন,—এবার আপনিই শুরু করুন।'

কী মনে ক'রে স্টুআর্ট আবার বললেন: 'দেখুন মিস্টার ফগ, আপনি যদি রাজি থাকেন তো আমি ষাট হাজার টাকা বাজি রাখবো। যখন একবার বলেছি বাজি ধরবো, তখন কোনোমতেই মিথ্যে হবে না সে-কথা।'

'বেশ তো, ভালো কথা।' ফগ বললেন: 'আমিও পিছু হঠবার পাত্র নই। ব্যারিংএর গদিতে আমার তিন লাখ টাকা জমা রয়েছে,—আমি সেই তিন লাখ টাকাই বাজি রাখছি।'

সলিভান অবাক হ'য়ে গেলেন। 'তিন লাখ টাকা বাজি! এ আপনি বলছেন কী মিস্টার ফগ? পাগল হলেন নাকি? একটা সামান্য-কিছু গোলযোগ হ'লেই তো আপনার সব টাকা

জলে যাবে! রাস্তায়-ঘাটে কত রকম বাধা-বিপত্তি আছে। এখন হয়তো বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু পরে—'

ফগ বাধা দিয়ে বললেন: 'অদৃষ্টপূর্ব এমন কিছু ঘটতেই পারে না।'

'এই যে আশি দিনের হিশেব, এর চেয়ে কম সময়ে সারা ছুনিয়া ঘুরে আসা কিন্তু অসম্ভব।'

'সব দিকে চোখ রেখে ঠিকমতো চলতে পারলে কম সময়েই সব কাজ করা যায়।'

'আপনাকে অনেকবার ট্রেন থেকে স্টীমারে, স্টীমার থেকে ট্রেনে ওঠা-নামা করতে হবে। একটু যদি দেরি হয়—'

'কে বললে আমার দেরি হবে?'

'এ আপনি ঠাট্টা করছেন নিশ্চয়ই!'

'ঠাট্টা? সত্যিকার ইংরেজ বাজি রেখে কখনো ঠাট্টা করে না। আপনাদের যাঁর ইচ্ছে তাঁর সঙ্গেই বাজি ধরতে আমি রাজি আছি। হ্যাঁ, তিন লাখ টাকার বাজি—আমি আশি দিনের মধ্যে সারা ছুনিয়া ঘুরে আসবো। আপনারা রাজি আছেন?'

নিজেদের মধ্যে পরামর্শ ক'রে সবাই জানালেন: 'হ্যাঁ, রাজি।'

'বেশ। পৌনে ন-টায় ডোভার মেল ছাড়ে—আমি ওতেই রওনা হচ্ছি।'

'সেকী!' স্টুআর্ট অবাক হ'য়ে গেলেন রীতিমতো। 'আজ সন্ধ্যায়ই?'

'হ্যাঁ, আজই সন্ধ্যায়। আজ দোসরা অক্টোবর বুধবার। একুশে ডিসেম্বর শনিবার পৌনে ন-টার মধ্যে আমি এই ক্লাব-ঘরে এসে হাজির হবো। যদি না-পারি, তবে ব্যারিংএর গদিতে আমার যে তিন লাখ টাকা আছে, সে-সবই আপনাদের হবে। এই নিন, ঐ টাকার চেক রাখুন।'

তক্ষুনি বাজির শর্তগুলো লেখা হ'লো। ছু-তরফই সেই দলিলে সই করলেন।

ফিলিয়াস ফগ তখনো আগের মতোই অবিচলিত। ফগ জানতেন যে তাঁর যথাসর্বস্ব হ'লো ছ-লাখ টাকা। এই অদ্ভুতপূর্ব ভ্রমণেই তার অর্ধেক খরচ হ'য়ে যাবে। তাই তিনি তিন লাখ টাকা বাজি ধরেছিলেন। তাঁর বন্ধু-বান্ধব সবাই খুব উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন,—টাকার জন্য নয়, এমন অবস্থায় এ-রকম বাজি ধরলে আপনা-আপনিই যেন বুক কেঁপে ওঠে।

ফগ কিন্তু নিশ্চিন্ত মনে তাস খেলছিলেন। দেখতে-দেখতে সাতটা বেজে গেলো। সবাই বললেন: 'আর না, এবার খেলা বন্ধ হোক। মিস্টার ফগকে যাত্রার জন্যে তৈরি হ'তে হবে তো!'

খেলতে-খেলতে ফগ বললেন: 'আমি তো তৈরিই আছি।'

সোয়া সাতটার সময় তাস খেলা ছেড়ে ফগ উঠে দাঁড়ালেন। হুইস্টের বাজি জিতে যে-তিনশো টাকা পেয়েছিলেন, তা কোটের পকেটে রেখে বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। পৌনে আটটার সময় ফগকে বাড়ি পৌঁছুতে দেখে পাসপার্তুত আশ্চর্য হ'লো—রুটিন অনুযায়ী তাঁর তো রাত দুপুরের আগে বাড়ি ফেরার কথা না!

ফগ নিজের ঘরে ঢুকে টেলিফোনে পাসপার্তুতকে ডাকলেন। পাসপার্তুত ঘরে ঢুকে পকেট থেকে ঘড়ি বার করলে, বললো, 'এখনো তো রাত দুপুর হয়নি!'

'সে আমি জানি।···দশ মিনিটের মধ্যেই আমাদের ক্যালের দিকে যেতে হবে।'

পাসপার্তুতকে হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ফগ আবার বললেন, 'আশি দিনের মধ্যে আমাকে সারা পৃথিবী ঘুরে আসতে হবে, তাই এক্ষুনি ক্যালে রওনা হ'তে হবে আমাদের। চলো, ট্রেনের আর দেরি নেই বিশেষ।'

পাসপার্তুত তো একেবারে থ! আশি দিনে সারা দুনিয়া ঘুরে আসা? সে যে একেবারে অসম্ভব! মাথা খারাপ হয় নি তো ফগের?

ফগ কিন্তু সেদিকে খেয়াল না-ক'রে ব'লে চললেন : 'জিনিশ-পত্র বিশেষ-কিছু নিতে হবে না। একটা কার্পেটের ব্যাগে গোটা-দুই শার্ট আর জোড়া-তিনেক মোজা নিলেই চলবে। তোমার জন্যেও তাই নিয়ো। আর যা-কিছু দরকার হবে, পথে যেতে-যেতে কিনে নিলেই হবে। আমার ম্যাকিণ্টশ আর বড়ো কোটটা নিয়ো। আমাদের অবিশ্যি বেশি হাঁটতে হবে না, তবু যেন দু-জোড়া বুটজুতো সঙ্গে থাকে। একি? চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে যে? শিগগির করো, শিগগির।'

অবাক পাসপার্তুত তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ঢুকে হতাশভাবে একটা চেয়ারে ব'সে পড়লো, আপন মনে বললো, 'নিয়তি কেন বাধ্যতে! আমার বরাতে বেশ হ'লো দেখছি! দু-দিন একটু শান্তিতে থাকবো ভেবেছিলুম! এখন খুব হ'লো!'

কিন্তু ভাববার অবসর কই? সময় নেই, এক্ষুনি রওনা হ'তে হবে। পাসপার্তুত দ্রুতহাতে জিনিশপত্র গুছোতো লাগলো, আর ভাবতে লাগলো, আশি দিনে সারা দুনিয়া ঘুরে আসা! তবে কি আমি পাগলের চাকরি নিলুম? না-না, এ যে একদম অসম্ভব! এ একটা তামাশা নিশ্চয়ই! পাঁচ বছর হ'লো দেশ ছেড়েছি, পাঁচ বছর পর আবার দেশের মুখ দেখতে পাবো,—সে হিশেবে ক্যালে যাওয়াটা একরকম ভালোই। পারী দেখতে উনি অন্তত একবার নিশ্চয়ই যাবেন—আর গেলে কি আর দুদিন না-থেকে পারবেন? কিন্তু তাই বা বলা যায় কী ক'রে? যিনি কখনো ঘরের বাইরে পা দেন নি, তিনি যখন পৃথিবী ভ্রমণে বেরোচ্ছেন, সেইটেই হ'লো আসল ভাববার কথা।'

আটটার মধ্যেই পাসপার্তুত জিনিশপত্র ব্যাগে ভ'রে তৈরি হ'য়ে নিলো, আর অস্থির মনে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে ফগের কাছে এসে দাঁড়ালো। ফগ এর মধ্যেই তৈরি হ'য়ে নিয়েছিলেন। হাতে ছিলো ব্র্যাড্‌শ'র কন্টিনেণ্টাল গাইড। পাসপার্তুতের কাছ থেকে

ব্যাগটা নিয়ে তার ভিতর একতাড়া ব্যাংক-নোট রেখে বললেন, 'সব ঠিকঠাক আছে তো? ব্যাগটা নাও। সাবধানে রেখো,—এর মধ্যে কিন্তু তিন লাখ টাকার নোট রইলো।'

তিন লাখ টাকা! ব্যাগটা পাসপার্তুতের কাছে হঠাৎ যেন খুব ভারি হ'য়ে উঠলো, মনে হ'লো, বুঝি আর হাতে ধ'রে রাখতে পারা যাচ্ছে না।

ছ'জনে নিচে নামলেন। দরজায় তালা পড়লো। একটা গাড়ি ডেকে চেআরিং ক্রস স্টেশনের দিকে রওনা হলেন তাঁরা। প্রায় সাড়ে আটটায় ফগ আর পাসপার্তুত স্টেশনের ভিতর প্রবেশ করলেন। একটি ভিখিরি এসে হাত পেতে দাঁড়াতেই ফগ জেব থেকে হুইস্টের বাজি-জিতে-পাওয়া টাকা ক-টা দিয়ে দিলেন,—আর পাসপার্তুত তাঁর এই দান দেখে ফগকে অত্যন্ত ভালোবেসে ফেললো।

পাসপার্তুত পারীর জন্যে ছুটো ফার্স্ট ক্লাশের টিকিট কিনে আনতে গেলো। এমন সময় রিফর্ম ক্লাবের সভ্যরা ফগকে 'সী-অফ' করতে স্টেশনে এসে হাজির হলেন। তাঁদের দেখে ফগ বললেন, 'এই দেখুন, আমি তো এক্ষুনি যাত্রা করছি। আমার পাসপোর্টে কন্সালের সই দেখলেই তো আপনাদের আর সন্দেহের কারণ থাকবে না?'

র্যালফ নম্র কণ্ঠে বললেন: 'না, না—পাগল? আপনার মুখের কথাই যথেষ্ট—পাসপোর্টের আর দরকার কী?'

স্টুআর্ট বন্ধুকে সতর্ক ক'রে দিলেন: 'কবে ফেরবার কথা তা যেন ভুলে না-যান।'

'আঠারোশো বাহাত্তর সালের একুশে ডিসেম্বর পৌনে ন-টা। আশা করি মনে থাকবে। আচ্ছা, চলি।'

পৌনে ন-টার সময় ডোভার মেল ছাড়লো। অন্ধকার রাত্রি, তার উপর টিপ-টিপ ক'রে বৃষ্টিও পড়ছিলো তখন। হঠাৎ পাসপার্তুত চেঁচিয়ে উঠলো: 'হায় হায়! তাড়াতাড়িতে আমার ঘরের বাতিটা নিবিয়ে দিতে ভুলে এসেছি!'

শান্ত কণ্ঠে ফগ বললেন, 'বেশ। আমরা যদ্দিন না ফিরছি বাতিটা অমনিই জ্বলতে থাকবে। দামটা অবিশ্যি তোমাকেই দিতে হবে।'

ট্রেন যদি হঠাৎ থামতো, পাসপার্তু তো নিশ্চয়ই বিদ্যুদ্বেগে দৌড়ে ফিরে যেতো। কিন্তু একঘেয়ে শব্দ ক'রে ডোভার মেল দ্রুতবেগে ছুটে চললো, সামনের দিকে।

দুই ।। মিঃ ফিক্স, ডিটেকটিভ ।।

ফগ জানতেন তাঁর এই বাজি নিয়ে বিলেতে একটা হৈ-চৈ প'ড়ে যাবে। হ'লোও তাই। এই অদ্ভুত বাজির কথা যখন খবরের কাগজে বেরোলো, তখন সারা ইংল্যাণ্ড আর আয়ারল্যাণ্ডে একটা তুমুল শোরগোল প'ড়ে গেলো। যে শুনলো, সেই নানান রকম যুক্তি-তর্ক দিয়ে এই দুঃসাহসিক পরিক্রমার পরিণাম আলোচনা করতে লাগলো। কেউ-কেউ বললে, ফগ নিশ্চয়ই সফল হবেন। কিন্তু বেশিরভাগ লোকেই বললো, এমন অসম্ভব ব্যাপার কক্ষনো সম্ভব হবে না—ফগের পরাজয় সুনিশ্চিত। অনেকে আবার বললো, এ ফগের পাগলামি ছাড়া আর কিছু না। 'টাইমস,' 'স্ট্যাণ্ডার্ড,' 'মর্নিং ক্রনিকল' ইত্যাদি খান-কুড়ি পত্র-পত্রিকা জানালো যে, 'এ-রকমটা কক্ষনো হবে না, ফিলিয়াসের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী।' শুধু 'ডেইলি টেলিগ্রাফ' ফিলিয়াসের পক্ষ নিলো। অনেকে বললে, ফিলিয়াস ফগ একটা পাগল। আর রিফর্ম ক্লাবের সভ্যরাও ডাহা উন্মাদ। মাথা খারাপ না-হ'লে কি কেউ এমনতর অসম্ভব ব্যাপারে বাজি ধরে?

'ইলাসট্রেটেড লণ্ডন নিউজে' যখন ফিলিয়াস ফগের ছবি বেরোলো, তখন কেউ-কেউ এবং অনেক মহিলা ফগকে সমর্থন করলেন। কেউ-কেউ এ কথাও বললেন, দুনিয়ায় কত আশ্চর্য ব্যাপার ঘটছে, আর এটা হবে না?

সাতুই অক্টোবর রয়্যাল জিয়োগ্রাফিক্যাল সোসাইটির পত্রিকায় একটা বিরাট প্রবন্ধ বেরোলো। প্রবন্ধলেখক বিরাট এক ফিরিস্তি দিয়ে উপসংহারে জানালেন যে, আশি দিনে পৃথিবী পরিক্রমার ব্যাপারটা এক উন্মাদ ছাড়া আর কারো পক্ষে ভাবাও সম্ভব নয়। প্রবন্ধটি বিলেতের সকল কাগজেই পুনর্মুদ্রিত হ'লো। আগে এই ব্যাপারে যে-সব বাজি ধরেছিলো লোকে, এই প্রবন্ধে ফিলিয়াসের নিশ্চিত পরাজয় জেনে সেই বাজি প্রত্যাহার করলো। সপ্তাহখানেক যেতে-না-যেতেই ফগের দল একান্ত দুর্বল হ'য়ে পড়লো।

এমন সময় স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের বড়ো কর্তা নিচের টেলিগ্রামটা পেলেন: 'ব্যাংকের নোট-চোর ফিলিয়াস ফগের খোঁজ পেয়েছি। ওকে বোম্বাইয়ে গ্রেপ্তার করার জন্যে পরোয়ানা চাই।—ডিটেকটিভ ফিক্স।'

এই খবর ছড়িয়ে পড়তে বিন্দুতিল দেরি হ'লো না। মুহূর্তমধ্যে ফিলিয়াস ফগ ঘৃণ্য ব্যাংক দস্যু ব'লে পরিচিত হ'য়ে পড়লেন। রিফর্ম ক্লাবের সভ্যদের ছবির মধ্যে ফিলিয়াসের যে-ছবি ছিলো, লোকে উৎসুক হ'য়ে সেই ছবির সঙ্গে দস্যুর চেহারা মিলিয়ে সমস্বরে ব'লে উঠলো: একি! ফিলিয়াস ফগ তবে দস্যু! সর্বনাশ! লোকটা কী চালাক! কেউ-কেউ বললে, ফিলিয়াস ফগ যে একটা দস্যু এ তো আগেই জানতুম। দস্যু না-হ'লে কি কেউ এমন একলা থাকে—ত্রিসংসারে কারো সঙ্গে মেলামেশা করে না? অনেকে বললে: অবাক কাণ্ড! ফিলিয়াস ফগ যে এত ভয়ানক লোক তা তো জানতুম না! যেই ব্যাংকের টাকাটা হাতে পড়েছে, অমনি পৃথিবী পরিভ্রমণের একটা ছুতো ক'রে সটকে পড়েছে, যাতে পুলিশ আর-কোনো খোঁজ না-পায়! ওঃ! কী সাংঘাতিক!

বরাত ব'লে যে একটা জিনিশ আছে, তা সঙ্গে-সঙ্গে থাকে। ফিলিয়াস ফগের অদৃষ্টও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলো, মিঃ ফিক্স ডিটেক-

টিভের বরাতও তাঁর কাছ-ছাড়া হয় নি। তবু দুজনের বরাৎ যে এমনিভাবে জড়িয়ে পড়বে, তা আগে কে জানতো?

পি. অ্যাণ্ড ও. কোম্পানির যতগুলো জাহাজ ছিলো, তার মধ্যে মংগোলিয়াই সবচেয়ে দ্রুত চলতে পারতো। নয়ই অক্টোবর বুধবার সুয়েজ-বন্দরে মংগোলিয়া জাহাজের পৌঁছোনোর কথা ব'লে জাহাজের প্রতীক্ষায় জাহাজ-ঘাট লোকে লোকারণ্য হয়েছে। সকলের মুখেই এক কথা: 'ঐ এলো, ঐ এলো!'

জাহাজের জন্যে অপেক্ষা করতে-করতে শ্রান্ত হ'য়ে দুই ভদ্রলোক সেই ভিড় ঠেলে জেটির ধারে পায়চারি করছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন সুয়েজের ইংরেজ কন্সাল। অন্যজন একটু বেঁটেখাটো ও শীর্ণ দেখতে,—চোখে বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য। কিসের যেন একটা চিন্তা ভদ্রলোককে এতই অধীর করেছিলো যে একটুও সুস্থির হ'তে পারছিলেন না। এঁরই নাম মিঃ ফিক্স, ডিটেকটিভ; ব্যাংক-দস্যু ধরবার জন্যে পোর্ট সুয়েজে এঁকে পাঠানো হয়েছিলো।

ব্যাকুল আগ্রহে মংগোলিয়া জাহাজের জন্যে অপেক্ষা করতে-করতে ফিক্স কনসালকে বললেন: 'আপনি তাহ'লে বলতে চান, মংগোলিয়ার কখনো দেরি হয় না?'

'না, কখনো দেরি হয় না। মংগোলিয়া কাল পোর্ট-সৈয়দ ছেড়েছে। অত বড়ো একটা জাহাজের কাছে সুয়েজ ক্যানাল আর কতটুকু পথ! ঠিক সময়ের আগে পৌঁছুলে গভর্মেণ্ট প্রত্যেকবার চারশো টাকা পুরস্কার দিয়ে থাকেন। আমি তো জানি মংগোলিয়াই বরাবর সে-টাকা পেয়ে এসেছে।'

'মংগোলিয়া কি বরাবর ব্রিন্দিসি থেকে আসে?'

'হ্যাঁ। ভারতবর্ষের ডাক ব্রিন্দিসিতেই জাহাজে ওঠে। শনিবার বিকেল পাঁচটায় জাহাজ ছেড়েছে,—এই এলো ব'লে। আপনি অত ব্যস্ত হবেন না। আচ্ছা, ব্যাংক দস্যু যদি সত্যি-সত্যিই

জাহাজে থাকে, আপনি দস্যুর চেহারার যে-বর্ণনা পেয়েছেন, তা থেকেই তাকে চিনে নিতে পারবেন ? আমার তো তা মনে হয় না।'

'চেহারা কি—আমার মন তাকে চিনিয়ে দেবে। চোখে না দেখেও যেমন কখনো কখনো গায়ের গন্ধে মানুষ চেনা যায়, এও ঠিক তেমনি। হাজার হাজার চোর দেখেছি আমি। যদি এই জাহাজে সে এসে থাকে তবে আমায় ফাঁকি দিতে পারবে না।'

'উঃ! কী সাংঘাতিক চুরি! ঈশ্বর করুন, আপনি যেন চোরকে ধরতে পারেন!'

'সাংঘাতিক ব'লে সাংঘাতিক! এমন চুরি ক'টা হয় ? ভাবুন দেখি, নগদ সাড়ে আট লাখ টাকা! এ কি যেমন-তেমন কথা! যদি ধরতে পারি, পুরস্কারও পাবো অঢেল। এমন সুযোগ জীবনে আসে ক'বার ? আজকাল যে কেমন হয়েছে, এমন জাঁহাবাজ চোর বড়ো একটা দেখতে পাওয়া যায় না। শুধু গোটাকতোক ছিঁচকে চোর আজকাল জ্বালিয়ে খাচ্ছে আমাদের!'

'বড়ো উত্তেজিত হ'য়ে পড়েছেন আপনি। আপনি যদি ধরতে পারেন, তবে তো ভালোই হয়। কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে কাজটা অতো সহজ হবে না। আপনি যাঁর চেহারার বর্ণনা পেয়েছেন তিনি হয়তো একজন নির্দোষ ভদ্রলোক।'

'বড়ো বড়ো চোরদের বাইরে দেখতে নিরীহ ভদ্রলোকই লাগে। ডাকাতের মতো চেহারা যার, সে কি আর সাহস ক'রে চুরি করতে পারে ? চেহারা দেখেই যে লোকে আগে তাকেই সন্দেহ করবে। ভণ্ড সাধুতার মুখোশ খুলে ফেলাই আমাদের কাজ—আর সত্যিকার বাহাদুরি তো তাতেই!'

জেটির উপর ভিড় তখন বেড়েই চলছিলো।

দিনটাও ছিল সুন্দর আর পচ্ছিরন্ন। পুবদিক থেকে সমুদ্রের সোঁদা-গন্ধ-মাখা হাওয়া বইছিলো ধীরে ধীরে।

জেটির ঘড়িতে সাড়ে দশটা বেজে গেলো।

ব্যগ্র হ'য়ে উঠলেন ফিক্স : 'না, এ জাহাজ আজ আর আসবে না দেখছি!'

কন্সাল বললেন : 'আর বেশি দেরি নেই।'

'সুয়েজে কতোক্ষণের জন্য নোঙর করবে?'

'ঘণ্টা-চারেকের জন্যে। এখানেই কয়লা তোলে জাহাজে। সুয়েজ থেকে এডেন তোরোশো দশ মাইল দূরে। বুঝতেই তো পারছেন, কতো কয়লা লাগে।'

'সুয়েজ থেকেই বুঝি সরাসরি বোম্বাই যায়?'

'হ্যাঁ, একদম বোম্বাই। পথে আর কোথাও দাঁড়ায় না।'

'তাই তো! ডাকাতটা যদি এই পথেই মংগোলিয়া জাহাজে এসে থাকে, তবে ইংরেজ পুলিশকে ফাঁকি দেয়ার মতলবে সুয়েজেই নামবে। তারপর এখান থেকে দিনেমার কি ফরাশিদের কোনো একটা কাছাকাছি উপনিবেশে যাওয়ার চেষ্টা করবে। ভারতবর্ষ তো ইংরেজের অধীন—সেখানে গেলে যে কোনো সুবিধে হবে না, তা সে বেশ জানে।'

'লোকটা যে ততো চালাক, আমার তা মনে হয় না। চালাক হ'লে আসবে কেন অ্যাদ্দুরে? লণ্ডনেই তো লুকিয়ে থাকা সহজ। অতো বিরাট শহরে কে তাকে খুঁজে বার করবে?' এই কথা ব'লে কন্সাল নিজের কাজে চ'লে গেলেন। তাঁর কথায় ফিক্সের চিন্তা আরো বেড়ে উঠলো।

একটু বাদেই ঘন-ঘন সিটি শোনা গেলো। যে যেখানে ছিলো সবাই দ্রুতপায়ে ছুটলো জেটির দিকে। তীরের নৌকোগুলো সঙ্গে-সঙ্গে নোঙর তুলে বাঁধন খুলে মংগোলিয়ার দিকে এগোলো। ঠিক এগারোটার সময় মংগোলিয়া নির্দিষ্ট জায়গায় নোঙর ফেলে হুশ-হুশ ক'রে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলো চোঙ দিয়ে।

অনেক যাত্রী ছিলো জাহাজে। কেউ-কেউ জাহাজের ডেক থেকেই চারদিকের দৃশ্য দেখতে লাগলো, কেউ-বা নৌকোয় চ'ড়ে

এলো তীরে। ফিক্স খুব সাবধানে প্রত্যেক আরোহীকে দেখতে লাগলেন। ব্যাংক-দস্যুর সন্ধানে তিনি যখন খুব ব্যস্ত, তখন একজন যাত্রী ভিড় ঠেলে কাছে এসে তাঁকেই শুধোলেন, 'মশায়, বলতে পারেন কন্সাল আপিশটা কোথায়?' কথা বলতে-বলতে আগন্তুক একটা পাসপোর্ট বার ক'রে বললেন, 'আমি কন্সালের সই নিতে চাই।'

ফিক্স পাসপোর্টটা হাতে নিয়ে পড়লেন। অমনি কেঁপে উঠলো তাঁর হাত। কী তাজ্জব ব্যাপার! এ যে সেই দস্যুরই পাসপোর্ট! এতে যার ছবি রয়েছে দস্যুরও ছবি যে ঠিক তেমনি! ফিক্স আগন্তুকের দিকে তাকালেন। বললেন: 'এ তো তোমার পাসপোর্ট নয়?'

'না, এটা আমার মনিবের।'

'তিনি কোথায়?'

'জাহাজে আছেন।'

'তাঁকেই কন্সাল আপিশে যেতে হবে, তুমি গেলে চলবে না।'

'আপিশটা কোথায়?'

সামনের একটা বাড়ি দেখিয়ে ফিক্স বললেন: 'ঐ সামনের মোড়টায়—ঐ-যে বাড়িটা দেখতে পাচ্ছ, ঐটেই।'

'তাহ'লে আমি যাই, তাঁকেই আনি গে।' এই ব'লে আগন্তুক ফের প্রত্যাবর্তন করলো জাহাজে।

ফিক্স আর বিন্দুতিল দেরি না-ক'রে কন্সালের কাছে গিয়ে বললেন, 'আপনাকে বিরক্ত করতে হ'লো ব'লে মাপ করবেন। নোট-চোর যে মংগোলিয়াতেই আছে, আমি তার বিশেষ প্রমাণ পেয়েছি।' এই ব'লে যা-যা ঘটেছে, সব খুলে বললেন।

সব শুনে কন্সাল বললেন: 'তাহ'লে সে এখানেই আসছে? কিন্তু সত্যিই যদি সে চোর হয় তাহ'লে সে কখনো এখানে আসবে না।'

'যদি তার বিন্দুমাত্র বুদ্ধি থাকে, তাহ'লে নিশ্চয়ই আসবে এখানে।'

'কেন? তার পাসপোর্টটা পাঁচজনকে দেখাতে নাকি?'

'হ্যাঁ। চোর-ডাকাতের পালানোর পথ নিষ্কণ্টক করা, আর ভালো মানুষকে খামকা জঞ্জালে ফেলা—এ ছাড়া পাসপোর্টের আর কোন দরকার আছে নাকি? এর পাসপোর্টটা যে ঠিকই আছে, তাতে আমার সন্দেহ নেই। আশা করি আপনি ওতে সই করবেন না?'

'কেন? পাসপোর্টে গোলমাল না-থাকলে আমাকে সই করতেই হবে।'

'তা হোক, কিন্তু যতোক্ষণ-না লণ্ডন থেকে ওয়ারেণ্ট পাচ্ছি ততোক্ষণ তো দস্যুকে এখানে আটকে রাখতে হবে।'

'সে হ'লো আপনার কাজ, আপনি তার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু আমার—' কন্সালের কথা শেষ হওয়ার আগেই দরজায় করাঘাত হ'লো। ভৃত্য এসে দু-জন অপরিচিত লোককে সেখানে পৌঁছে দিয়ে প্রস্থান করলো। এঁদের একজন একটা পাসপোর্ট নিয়ে সই করবার জন্যে কন্সালের হাতে তুলে দিলেন। কন্সাল পাসপোর্টটা ভালো ক'রে পরীক্ষা করতে লাগলেন আর ফিক্স নীরবে ব'সে আগন্তুকের আপাদমস্তক খুব ভালো ক'রে দেখতে লাগলেন। পাস-পোর্ট দেখে কন্সাল শুধোলেন: 'আপনার নামই ফিলিয়াস ফগ?'

'হ্যাঁ।'

'এই লোকটা কি আপনার ভৃত্য?'

'হ্যাঁ। ওর বাড়ি ফ্রান্সে। নাম জাঁ পাসপার্তু।'

'আপনি লণ্ডন থেকে আসছেন? যাবেন কোথায়?'

'হ্যাঁ, লণ্ডন থেকেই আসছি। যাবো বোম্বাই। আমি যে এসেছি, আপনার সই নিয়ে প্রমাণ রাখতে চাই।'

কন্সাল দ্বিরুক্তি না-ক'রে পাসপোর্টে স্বাক্ষর করলেন। ফগ তাঁর ফি চুকিয়ে দিয়ে অভিবাদন ক'রে পাসপার্তুকে নিয়ে প্রস্থান করলেন।

ব্যগ্রকণ্ঠে ফিক্স শুধোলেন : 'এখন আপনার কী মনে হয় ?'

'ভদ্রলোক তো ভালোমানুষ ব'লেই মনে হ'লো।'

'হ'তে পারে। কিন্তু সে-কথা হচ্ছে না। ভদ্রলোকের চেহারার সঙ্গে দস্যুর চেহারা কি হুবহু মিলে যাচ্ছে না ?'

'তা মিলছে, কিন্তু সব সময় চেহারার র্বনা—'

বাধা দিয়ে ফিক্স বললেন : 'সে আমি দেখে নিচ্ছি। ভৃত্যের কাছে ঘেঁষা অসুবিধে হবে না বিশেষ। লোকটাও যখন ফরাশি, তখন মুখ বুজে থাকতে পারবে না কিছুতেই। আচ্ছা, চলি তবে। এক্ষুনি আসছি আবার।' ফিক্স তক্ষুনি পাসপার্তুতের খোঁজে বেরোলেন।

কন্সালের আপিশ থেকে বেরিয়ে ফগ জেটিতে ফিরলেন। পাস-পার্তুতকে কতোগুলো কাজের ভার দিয়ে ফিরে গেলেন জাহাজে।

ফিলিয়াস ফগের ডায়েরিতে দোসরা অক্টোবর থেকে একুশে ডিসেম্বর অবধি প্রত্যেক দিনের জন্য নির্দিষ্ট স্থান ছিলো। কোন মাসে, কোন তারিখে, কোন বারে, ক-টার সময় তাঁকে প্যারী, ব্রিন্দিসি, সুয়েজ, বোম্বাই প্রভৃতি বড়ো-বড়ো জায়গাগুলোয় পৌঁছুতে হবে, তা লেখা ছিলো। কোন জায়গায় পৌঁছুতে নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে কতো বেশি বা কতো কম সময় লাগলো, তাও তিনি লিখে-ছিলেন। জাহাজে এসে ডায়েরি বার করলেন তিনি। তাতে লেখা ছিলো দোসরা অক্টোবর বুধবার রাত্রি পৌনে ন-টার সময় লণ্ডন ত্যাগ। বৃহস্পতিবার ভোর আটটা চল্লিশ মিনিটের সময় প্যারী। শুক্রবার চৌঠা অক্টোবর ভোর ছ-টা পঁয়ত্রিশে মঁসিনেইএর পথে তুরীন শহরে আগমন—সাতটা কুড়িতে তুরীন পরিত্যাগ। শনিবার পাঁচই অক্টোবর বিকেল চারটেয় ব্রিন্দিসি, বিকেল পাঁচটায় মংগোলিয়া জাহাজে যাত্রা। এবার ফগ লিখলেন : বুধবার নয়ই অক্টোবর বেলা এগারোটায় পোর্ট সুয়েজে আগমন। এ পর্যন্ত লেগেছে মোট সাড়ে ছ-দিন।

একটু পরেই ফিক্সের সঙ্গে পাসপার্তুতের দেখা হ'লো জেটিতে। ফিক্স শুধোলেন: 'কী হে? তোমাদের পাসপোর্টে ঠিক স্বাক্ষর করা হয়েছে তো?'

'আপনি যে! ধন্যবাদ! হ্যাঁ, সবই ঠিক হয়েছে।'

'বোম্বাই চলেছো বুঝি?'

'হ্যাঁ। এতো তাড়াতাড়ি আমরা চলেছি যে আমার কাছে সবই স্বপ্ন ব'লে মনে হচ্ছে। এইটে তো সুয়েজ, কেমন না?'

'হ্যাঁ, সুয়েজ।'

'তাহ'লে আমরা মিশরে, মানে আফ্রিকাতে এসেছি! সত্যি-সত্যিই কি আমরা এখন আফ্রিকায়? একবার ভাবুন দেখি ব্যাপারখানা! আমার তো ধারণাই ছিলো না যে, আমরা কখনো প্যারীর বাইরে যাবো! সেখানে কতোক্ষণই বা ছিলাম—একঘণ্টা মাত্র। এখন আমার বড়ো আপশোশ হচ্ছে। প্যারীর সুন্দর-সুন্দর জায়গাগুলো দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে আবার।'

'তা'হলে দেখছি তোমাদের বড্ডো তাড়াতাড়ি চলতে হচ্ছে?'

'আমার আর তাড়াতাড়ি কী, আমার মনিবেরই যতো তাড়াতাড়ি। ভালো কথা, আমাকে খান-কয় কামিজ আর একজোড়া জুতো কিনতে হবে। লণ্ডন থেকে রওনা হবার সময় আমাদের সঙ্গে ছোট একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ ছাড়া কিছুই ছিলো না।'

'চলো, এক্ষুনি তোমাকে বাজারে নিয়ে যাচ্ছি। সেখান যা-যা দরকার, সব পাবে।'

'আপনি অতি সজ্জন।' সবিনয়ে বললে পাসপার্তুত: 'আচ্ছা, চলুন। জাহাজ ছাড়ার আগেই আবার আমাকে ফিরে আসতে হবে তো!'

ফিক্স বললেন : 'এখনো জাহাজ ছাড়ার দেরি আছে। এই তো সবে বারোটা বেজেছে।'

পাসপার্তু পকেট থেকে তার প্রকাণ্ড ঘড়িটা বার করলো। 'বারোটা বেজেছে! আমার ঘড়িতে তো ন-টা বাহান্ন বাজে!'

বাইরের দিকে পা চালাতে-চালাতে ফিক্স বললেন : 'তাহ'লে তোমার ঘড়ি ভুল।'

'ভুল!' পাসপার্তুর গলা তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠলো। 'আমার ঘড়ি ভুল! ঠাকুরদাদার আমল থেকে ঘড়িটা ঠিক সময় দিয়ে আসছে, আর আজ ভুল হ'য়ে গেলো! বছরে পাঁচ মিনিটও এদিক-ওদিক হয় না—আর আজ দু'তিন ঘণ্টার ফারাক হ'য়ে গেলো! কী বলছেন মশাই আপনি? এ কি আমার যে-সে ঘড়ি! ঠিক যেন একটা ক্রনোমিটার!'

'কেন যে সময়ের অতো তফাৎ হয়েছে, আমি তা বুঝতে পেরেছি,' ফিক্স বললেন : 'তোমার ঘড়িতে লণ্ডনের সময় আছে। সুয়েজের সময় আর লণ্ডনের সময় এক না,—সুয়েজে যখন বারোটা, তখন লণ্ডনে প্রায় দশটা। যেখানেই যাও, বেলা ঠিক বারোটার সময় সেই দেশের ঘড়ির সঙ্গে নিজের ঘড়ি মিলিয়ে নিয়ো—তাহ'লেই ঠিক সময় থাকবে।'

'চাইনে আমি অন্য দেশের সময়! আমার ঘড়ি যেমন আছে, তেমনি থাক। আমার ঘড়ি কি ভুল হ'তে পারে, মশায়?' সগর্বে পাসপার্তু তার ঘড়িটা পকেটের মধ্যে রেখে দিলে।

ফিক্স শুধোলেন : 'তোমরা বোধহয় তাড়াহুড়ো ক'রে লণ্ডন থেকে বেরিয়েছো? যাচ্ছো কোথায়?'

'হ্যাঁ, খুব তাড়াহুড়ো ক'রে বেরোতে হয়েছে আমাদের। বুধবার রাত ঠিক আটটার সময় আমার মনিব তাঁর ক্লাব থেকে ফিরে এলেন, তারপর ঠিক পৌনে এক ঘণ্টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়তে হ'লো আমাদের। উনি সারা দুনিয়া ঘুরে আসতে বেরিয়েছেন কিনা, তাই বরাবর সামনের দিকেই চলেছি আমরা।'

'সারা ছুনিয়া ঘুরে আসতে বেরিয়েছেন ?'

'হ্যাঁ, তাও আবার মাত্র আশি দিনে। আমাকে বললেন যে, বাজি রেখে এই কাজে হাত দিয়েছেন,—কিন্তু, আপনাকে বলতে আপত্তি নেই, আমি এ-কথার বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস করি নে। মাথার ঠিক থাকলে কি কেউ এমনিতরো কাজে হাত দেয় ? আমার তো মনে হয় এর অন্য কোনো কারণ রয়েছে।'

'ভারি আশ্চর্য মানুষ তো তোমার মনিব! ওঁর জুড়ি মেলা ভার! উনি কি খুব ধনী নাকি!'

'বিরাট ধনী! তাঁর সঙ্গে টাকা কতো! সবই টাটকা ব্যাংক-নোট। খরচ করতে তো কুন্ঠিত দেখিনি কখনো। নির্দিষ্ট সময়ের আগে বোম্বাই পৌঁছুতে পারলে মংগোলিয়ার এঞ্জিনম্যানকে পুরস্কার দেবেন বলেছেন।'

'তুমি বুঝি অনেক দিন থেকে তাঁর চাকরি করছো ?'

'অনেক দিন ? যেদিন আমরা লণ্ডন ছেড়েছি, ঠিক সেদিন থেকেই আমার চাকরির শুরু।'

পাসপার্তুতের কথা শুনে ফিক্সের মন যে কী ভাবে আলোড়িত হ'লো, তা সহজেই অনুমেয়। ব্যাংকে চুরি হওয়ার পরেই অতো তাড়াহুড়ো ক'রে লণ্ডন থেকে বেরিয়ে পড়া, সঙ্গে কাঁড়ি-কাঁড়ি ব্যাংক-নোট, একটা বাজির ভান ক'রে ভারতবর্ষে পৌঁছোনোর জন্যে এতো ব্যগ্রতা—এ সমস্তই ফিক্সের সন্দেহকে আরো সুদৃঢ় ক'রে তুললো। আরো খোঁজ-খবর নেয়ার জন্যে ফিক্স পাস-পার্তুতের সঙ্গে নানান কথা বলতে লাগলেন।

পাসপার্তুত শুধোলো: 'বোম্বাই তো ভারতবর্ষে, মানে এশিয়ায়, —এখান থেকে বুঝি অনেক দূর ?'

'নেহাৎ কাছে নয়, জাহাজে দিন-দশেক লাগে।'

'উঃ! বাতিটার কথাই আমার দিনরাত মনে হচ্ছে!'

'বাতি ? কিসের বাতি ?'

'যখন আমি লণ্ডন থেকে আসি, তখন আমার ঘরের গ্যাসের বাতিটা নিভিয়ে দিতে ভুলে এসেছি। বাতিটা আমারই খরচে এখন পর্যন্ত জ্বলছে। বাতিটার জন্যে আমার দৈনিক দেড় টাকা ক'রে লোকশান হচ্ছে—আমার দৈনিক মাইনের চেয়েও রোজ ছ-আনা ক'রে বেশি টাকা যাচ্ছে! যদি আমরা তাড়াতাড়ি লণ্ডনে ফিরতে না পারি, তবে—'

পাসপার্তুতের দুর্দশায় কান দেবার অবসর তখন ফিক্সের কই! মংগোলিয়া জাহাজে স্বচ্ছন্দচিত্তে ব্যাংক-দস্যু ফিলিয়াস ফগ বোম্বাই পালাচ্ছে, অথচ তাকে ধরবার উপায় নেই! পুরস্কারের টাকাটা মুঠোর মধ্যে এসেও বেরিয়ে যাচ্ছে! ইশ! এর চেয়ে আর কী বিড়ম্বনা আছে! দস্যুকে ধরবারও উপায় নেই, দেরি করবারও সময় নেই। ফিক্স পাসপার্তুতকে একটা দোকানে রেখে দ্রুতপায়ে কন্সালের আপিশে এসে বললেন: 'ফিলিয়াস ফগই যে দস্যু, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। আশি দিনে পৃথিবী ঘুরে আসার অছিলা ক'রে স'রে পড়বার তালে আছে আর-কি!'

'কিন্তু, মিস্টার ফিক্স, আপনার ভুল হয় নি তো? সত্যিই কি ফিলিয়াস ফগ সেই দস্যু?'

'আমার দৃঢ় বিশ্বাস ফিলিয়াস ফগই সেই ব্যাংক-দস্যু।'

'সে যে সুয়েজে এসেছিলো, পাসপোর্টে আমার সই নিয়ে তার প্রমাণ রাখার কারণ কী বলতে পারেন?'

'সে-কথাটার জবাব ঠিক দিতে পারছি না বটে, কিন্তু যেসব খবর জোগাড় করেছি, শুনুন।' পাসপার্তুতের সঙ্গে তাঁর যেসব কথাবার্তা হয়েছিলো, ফিক্স সব খুলে বললেন কন্সালকে। সব শুনে কন্সাল বললেন, 'তা ঠিক। বাইরের সব অবস্থাই যে লোকটার বিরুদ্ধে, তা অস্বীকার করা যায় না। তা আপনি এখন কী করবেন ব'লে ঠিক করেছেন?'

'একটা ওয়ারেন্ট পাঠাবার জন্যে আমি এক্ষুনি তার করছি:

লণ্ডনে। ওয়ারেন্টটা বোম্বাইতে এলেও চলবে। আমাকেও এই জাহাজে বোম্বাই যেতে হচ্ছে। বোম্বাই ইংরেজের রাজত্বে—সেখানে দস্যুকে গ্রেপ্তার করতে আর মুশকিল কী?'

মংগোলিয়া ছাড়বার আর অল্প সময় বাকি ছিলো দেখে ফিক্স বিদায় নিলেন। তারপর ওয়ারেন্টের জন্য স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে তার ক'রে একেবারে জাহাজে এসে উঠলেন।

সুয়েজ থেকে এডেন তেরোশো দশ মাইল দূরে। সাধারণ জাহাজ একশো আটত্রিশ ঘণ্টাতেই এই পথ পেরোতে পারে, কিন্তু মংগোলিয়া যে-বেগে এসেছিলো, তাতে সবাই বলেছিলো যে নির্দিষ্ট দিনের অনেক আগেই জাহাজ এডেনে পৌঁছুবে।

ব্রিন্দিসি থেকে যাঁরা জাহাজে উঠেছিলেন, তাঁদের অনেকেই ভারতবর্ষে আসছিলেন। কেউ-বা কলকাতা যাবেন, কেউ-বা থাকবেন বোম্বাইয়ে। ভারতবর্ষের পেনিনস্যুলার রেলপথ খোলা হয়েছিলো ব'লে তখন আর সিংহল ঘুরে কলকাতায় আসতে হ'তো না।

জাহাজে ফিলিয়াস ফগের তিনজন সঙ্গী জুটেছিলো। তাঁরাও ছিলেন ফগের মতো তাসখেলা-পাগল। ঠিক সময়ে আহার করা, আর সঙ্গীদের সঙ্গে হুইস্ট খেলা ছাড়া তাঁর আর কোনো কাজ ছিলো না। এতো বড়ো একটা বাজি ধরেছেন ব'লে মুহূর্তের জন্যও তাঁকে বিচলিত দেখাতো না।

পাসপার্তুতও বেশ স্বচ্ছন্দচিত্তেই দিন কাটাচ্ছিলো। সমুদ্রের দৃশ্য দেখে আর জাহাজের দামি-দামি খাবার খেয়ে বেশ ভালোই দিন কাটছিলো তার। জাহাজের ডেকে পায়চারি করতে-করতে ফিক্সের সঙ্গে তার দেখা হ'য়ে গেলো। ফিক্সকে দেখেই সে বললে: 'আপনাকে তো আমি সুয়েজে দেখেছি, না? সেখানে আপনি অনুগ্রহ ক'রে আমার জন্য কতো কষ্ট স্বীকার করেছিলেন।'

'আরে, তুমি যে! সেই মাথা-পাগল ইংরেজ ভদ্রলোকের ফরাশি ভৃত্য, কেমন না?'

'আপনি ঠিকই ধরেছেন মিস্টার—'

'আমার নাম ফিক্স।'

'মিস্টার ফিক্স, আপনাকে জাহাজে দেখে খুব খুশি হলাম। যাচ্ছেন কোথায়?'

'বোম্বাই।'

'বাঃ, ভালোই হ'লো। আপনি কি আর কখনো বোম্বাই গিয়েছিলেন?'

'অনেকবার। পি. অ্যাণ্ড ও. কোম্পানির আমি একজন এজেণ্ট কি-না!'

'ভারতবর্ষের সঙ্গে আপনি তাহ'লে পরিচিত দেখছি। ভারতবর্ষ একটা আজব দেশ, কেমন না?'

'তা একরকম আজব দেশ বলতে পারো।' ফিক্স তাঁর বই-পড়া বিদ্যেকে স্মরণ করবার চেষ্টা করলেন। 'সেখানে কতো মশজিদ, মিনার, মন্দির আছে। কতো সাপ-বাঘ সেখানে দেখতে পাওয়া যায়। মিস্টার ফগ ভালো আছেন তো?'

'বেশ সুস্থ আছেন। আমিও ভালোই আছি। ঠিক রাক্ষসের মতো খাচ্ছি আজকাল। সমুদ্রের হাওয়া বোধহয় খিদে বাড়ায়।'

'কই, তোমার মনিব তো কখনো ডেকে আসেন না?'

'না। এসব বিষয়ে তাঁর কোনো কৌতূহল নেই।'

'আমার মনে হয়, এই আশি দিনে সারা দুনিয়া ঘুরে আসার ব্যাপারটা একটা ভান মাত্র। এর ভিতরে বিশেষ কোনো একটা গুরুতর বিষয় লুকোনো আছে। তুমি কী বলো?'

'শপথ ক'রে বলতে পারি, আমি এ-সবের কিছুই জানি না। আর জানবার আগ্রহও নেই আমার।'

তখনকার মতো কথাবার্তা এখানেই শেষ হ'লো। কিন্তু পরে সুযোগ পেলেই ফিক্স পাসপার্তুর কাছ থেকে খবর বার করবার চেষ্টা করতেন। সেজন্য মাঝে-মাঝে দু-এক গেলাশ সরাব পান

করতে আমন্ত্রণ জানাতেন তিনি। পাসপার্তু ভাবতো, বাঃ, লোকটা কী ভদ্র, এমন ভদ্রলোক তো সচরাচর দেখা যায় না!

দ্রুতগামী মংগোলিয়া মোসা ছাড়লো, বেবেলমণ্ডেব ছাড়লো, এডেন বন্দরের উত্তরে অবস্থিত স্টীমার পয়েন্ট ছাড়লো ক্রমে-ক্রমে। বোম্বাই তখনো ষোলোশো পঞ্চাশ মাইল দূরে। পনেরো তারিখে এডেন পৌঁছুনোর কথা হ'লেও চোদ্দোই অক্টোবর সন্ধেবেলাই মংগোলিয়া এডেন পৌঁছেছিলো। ফিলিয়াস ফগ পনেরো ঘণ্টার মতো সময় হাতে পেলেন তাই। স্টীমার পয়েণ্টে নেমে ফিলিয়াস ফগ পাসপোর্টে সই করিয়ে এনেছিলেন। বলা বাহুল্য, ফিক্স অলক্ষ্যে তখন তাঁকে অনুসরণ করতে ছাড়েন নি।

সন্ধে ছ'টার সময় জাহাজের নোঙর উঠলো। বিপুল ভারত মহাসাগরের উচ্ছ্বসিত নীল জল কেটে বোম্বাইয়ের দিকে চললো মংগোলিয়া। তখনো বোম্বাই প্রায় একশো সত্তর ঘণ্টার পথ ছিলো।

আকাশ ছিলো পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। আবহাওয়া ছিলো চমৎকার। আস্তে-আস্তে বাতাস বইছিলো। ক্যাপ্টেন সুযোগ বুঝে পাল তুলে দিলেন। কলে আর পালে দ্রুত থেকে দ্রুততর হ'য়ে উঠলো জাহাজের গতি।

চার ।। ঘূর্ণিপাকে

যেদিন পৌঁছনোর কথা, তার দুদিন আগেই মংগোলিয়া বোম্বাইয়ের জাহাজ-ঘাটায় এসে ভিড়লো। সন্ধে আটটার সময় কলকাতার ট্রেন ছাড়বে। ফগ হুইস্ট খেলা শেষ ক'রে তীরে নামলেন। পাস-পার্তুকে কতোগুলো দরকারি জিনিশপত্র কিনতে দিয়ে সময়মতো রেলস্টেশনে হাজির হ'তে বললেন, তারপর গেলেন কন্সাল আপিশে। বোম্বাইয়ের দ্রষ্টব্য স্থানগুলোর প্রতি কিছুমাত্র আকর্ষণ ছিলো না ফগের। তাই, কন্সাল আপিশ থেকে বেরিয়ে সোজা স্টেশনে চ'লে এলেন তিনি, আর সেখানেই আহার সমাধা করলেন।

ফিক্স একটু বাদেই জাহাজ থেকে নেমে পুলিশ আপিশে গেলেন। সেখানে নিজের পরিচয় দিয়ে দস্যুর পশ্চাদ্ধাবনের কাহিনী বর্ণনা করে শুধোলেন : 'লণ্ডন থেকে কোন ওয়ারেণ্ট এসেছে কি?' উত্তরে শুনলেন, 'না, আসে নি।' ওয়ারেণ্টটির লণ্ডন থেকে বোম্বাইয়ে পৌঁছুবার উপযুক্ত সময় তখনো হয় নি। ফিক্স হতাশ হ'য়ে পড়লেন। তবু পুলিশ কমিশনারের কাছে একটা ওয়ারেণ্ট প্রার্থনা করলেন। পুলিশ কমিশনার জানালেন : এই ওয়ারেণ্ট বিলেত থেকে দেবে—আমার দেয়ার কোনো এক্তিয়ার নেই।'

নিরুপায় হ'য়ে বিলেতের ওয়ারেণ্টের অপেক্ষায় রইলেন ফিক্স। দস্যু যাতে পালিয়ে যেতে না পারে, সেজন্যে রাখলেন কড়া নজর। তাঁর দৃঢ়বিশ্বাস ছিলো ফগ অন্তত দু-চারদিন বোম্বাই থাকবেনই। তদ্দিনে ওয়ারেণ্ট এসে উপস্থিত হবে নিশ্চয়ই।

পাসপার্তুতেরও ধারণা ছিলো যে তারা কিছুকাল বোম্বাই থাকবে। কিন্তু তার দিবাস্বপ্ন ভেঙে যেতে দেরি হয়নি। সে দেখলো অন্তত কলকাতা পর্যন্ত যেতেই হচ্ছে—কে বলতে পারে আরো দূর-পথ যেতে হবে কি-না। তার ধীরে-ধীরে বিশ্বাস হ'তে লাগলো তবে বুঝি বাজির কথা মিথ্যে নয়। সে তার পোড়া অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগলো।

ফগের কথামতো জিনিশপত্র কিনে পাসপার্তুত রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলো। যতো ঘোরাঘুরি করতে লাগলো, ততোই তার কৌতূহল বেড়ে চললো। বোম্বাইয়ের জাঁকজমক তার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রলো।

রেল-স্টেশনের পথে আসতে-আসতে সে দেখলে, অনতিদূরে মালাবার গিরি-শৃংগে একটা সুন্দর মন্দির দেখা যাচ্ছে। এমন চকমিলানো সুন্দর মন্দিরটা একবার দেখে যাওয়া দরকার ভেবে সে মন্দিরের দিকে এগোলো।

ফরাশি পাসপার্তুত জানতো না যে হিন্দুর মন্দিরে, এমনকি

মন্দির-প্রাঙ্গণে পর্যন্ত খ্রীষ্টানরা ঢুকতে পারে না। যারা প্রবেশ করতে পারে, তাদেরও মন্দিরের বাইরে জুতো রেখে প্রবেশ করতে হয়। এই নিয়ম অবহেলা করলে ইংরেজ-আদালতে নিয়মভঙ্গকারীর শাস্তি অনিবার্য।

অনভিজ্ঞ পাসপার্তুত যখন নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে জুতো প'রে মন্দির-প্রাঙ্গণে ঢুকে সোল্লাসে মনে-মনে মন্দিরের কারুকার্যের প্রশংসা করছিলো, তখন কে যেন এসে চক্ষের পলকে এক ধাক্কায় তাকে মাটিতে ফেলে দিলে। সে তাকিয়ে দেখলে, তিনজন ক্রুদ্ধ হিন্দু তার কাছে দাঁড়িয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় তীব্রকণ্ঠে তিরস্কার ক'রছে। একজন জোর ক'রে তার জুতো খুলে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিলে; আর অন্য দুজন তাকে আক্রমণ ক'রে সাংঘাতিক ভাবে প্রহার করতে লাগলো।

পাসপার্তুত নিজেকে সামলে নিয়ে চক্ষের পলকে উঠে দাঁড়ালো। তারপর দু-চারটে ঘুসি মেরে বিপক্ষ দলকে একটু হতচকিত ক'রে দিয়ে তীরবেগে পলায়ন করলো। অমনি চারদিকে ধর-ধর শব্দ উঠলো। কিন্তু পাসপার্তুত কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজপথের জনারণ্যে মিশে গেলো, আর কেউ তার সন্ধান পেলো না।

ট্রেন ছাড়বার পাঁচ মিনিট আগে পাসপার্তুত হাঁপাতে-হাঁপাতে স্টেশনে এসে হাজির হ'লো। জামা-কাপড় ছিঁড়ে ফালা-ফালা, মাথায় নেই টুপি, খালি পা। ফগের জন্য যেসব জিনিশ কিনেছিলো, গোলমালের সময় সেগুলো যে কোথায় পড়েছে কে জানে। ফিক্স তখন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ফিলিয়াস ফগের কাছেই অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পাসপার্তুতের দুরবস্থা দেখে তিনি অবাক হ'লেন। পাসপার্তুত তার দুর্দশার কাহিনী সংক্ষেপে ফগকে খুলে বললে। ফগ শান্তভাবে গাড়িতে উঠতে-উঠতে বললেন: 'আশা করি এমন কাজ আর কক্ষনো করবে না।' খালি-মাথা খালি-পা হতবুদ্ধি পাসপার্তুত আর দ্বিরুক্তি না করে গাড়িতে উঠে বসলো।

ঠিক সময়েই ইয়োকোহামা পৌঁছলো 'কর্নাটিক।' পাসপার্তুকে আজ জাহাজ থেকে তো নামতেই হবে, তারপর সারাদিন খাওয়া জুটবে কি না কে জানে? জাহাজেই তাই ঠেশে খেয়ে নিয়ে তীরে নামলো সে। নেমেই দেখলো, সামনে সুদূরবিস্তৃত রাজপথ লোকের ভিড়ে গমগম করছে। লক্ষহীন পাসপার্তু রাজপথ ধ'রে এগোলো সামনে।

সে ঠিক করলো, নেহাৎ যদি অন্য কোনো উপায় না হয়, তাহ'লে ইংরেজ কিংবা ফরাশি কন্সালের কাছে নিজের অবস্থা জানাবে। তাঁরা হয়তো কোনো একটা উপায় ক'রে দেবেন। কিন্তু তার আগে একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখা উচিত।

ইয়োকোহামার সাহেব-পাড়া, জাপানি-পাড়া পেরিয়ে বাজারে এসে হাজির হ'লো পাসপার্তু। হিরে-মুক্তোর দোকান, রেস্তোরাঁ, কাফে, দোকান-পশার কিছুরই অভাব নেই। চারদিক দেখতে-দেখতে সারাদিন ইতস্তত ঘুরে বেড়ালো সে। ক্রমশ সন্ধে হ'য়ে এলো। খিদেয় পেট জ্বলতে থাকলেও পয়সার অভাবে খাওয়া জুটলো না তার। পাসপার্তু এবার বুঝতে পারলো যে ঘর থেকে পা বাড়াতে হ'লেই কিছু টাকা সঙ্গে না-রাখলে চলে না।

অর্থহীন লক্ষহীন পাসপার্তু জেটির দিকে এগোলো।

রাতটা কী ক'রে কাটলো, পাসপার্তু নিজেই ভালো ক'রে বুঝতে পারলো না। ভোরবেলা সে দেখলো খিদে তাকে এতো দুর্বল ও ক্লান্ত ক'রে ফেলেছে যে পেটে দানাপানি না-পড়লে আর চলে না। একটা পয়সাও নেই, খাওয়াবে কে? তখনো ঘড়িটা ছিলো সঙ্গে। কিন্তু ঘড়িটা পাসপার্তুর এতো প্রিয় ছিলো যে সে ঠিক করলো, বরং না-খেয়ে মরবে, কিন্তু তবু ঘড়িটা বিক্রি করবে না। ভেবে দেখলো, এই অবস্থায় পোশাক বদলালে বিশেষ কোনো ক্ষতি হবে না, বরং পকেটে কিছু আসতে পারে।

পাসপার্তু পুরোনো পোশাকের দোকান খুঁজে বের ক'রে

নিজের পোশাকের বদলে একটি পুরোনো জাপানি পোশাক ও কিছু পয়সা পকেটে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এলো। কাছের একটা হোটেলে কিছু খেয়ে নিয়ে পাসপার্তুত জাহাজ-ঘাটার দিকে এগোলো। ইচ্ছে, যদি আমেরিকা-গামী কোনো জাহাজে কাজ নিয়ে জাপান ছাড়তে পারে।

কিন্তু সুপারিশ ছাড়া চাকরির সৌভাগ্য হয় না কারোই। সুপারিশ নেই ব'লে পাসপার্তুত কোথাও চাকরি পেলো না। হাল ছেড়ে দিয়ে যখন শহরে ফিরছে, তখন একটা প্রকাণ্ড বিজ্ঞাপন তার নজরে পড়লো :

"সুবিখ্যাত উইলিয়ম বাটুলকারের জাপানি সার্কাস পার্টি!
আমেরিকা যাওয়ার আগে শেষ রজনী!
আশ্চর্য নাকের কশরত!
দেখবার শেষ সুযোগ কেউ ছাড়বেন না।"

বিজ্ঞাপন দেখে পাসপার্তুত ভাবলে, এরা যখন আমেরিকা যাচ্ছে, তখন কোনো রকমে এদের দলে ভিড়তে পারলে সুবিধেই হবে। একবার চেষ্টা ক'রে দেখা যাক। পাসপার্তুত তক্ষুনি সার্কাস পার্টির ঠিকানা জোগাড় ক'রে উইলিয়ম বাটুলকারের কাছে গিয়ে হাজির হ'লো।

বাটুলকার যখন শুনলো পাসপার্তুত চাকরি করতে চায়, তখন সোজাসুজি জানিয়ে দিলো যে তার যথেষ্ট লোক আছে, আর লোকের দরকার নেই। বেগতিক দেখে পাসপার্তুত বললে : 'যদি আমি আপনাদের সঙ্গে আমেরিকা যেতে পারতুম, তবে বড্ডো উপকার হ'তো।'

বাটুলকার শুধোলো : 'তুমি তো জাপানি নও ব'লেই মনে হচ্ছে, তবে এমন পোশাক পরেছো যে?'

'যার যেমন সাধ্যি, সে তেমনি পোশাক পরে।'

'বেড়ে বলেছো তো! তোমাকে দেখে তো ফরাশি ব'লেই মনে হচ্ছে।'

'আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছেন'

'কেমন ক'রে মুখভঙ্গি করতে হয় সে তাহ'লে তোমার ভালোই জানা আছে?'

পাসপার্তু এ-কথা শুনে চ'টে উঠলো। কিন্তু নিরুপায় হ'য়ে বললে: 'ফরাশিরা যে মুখভঙ্গি করতে পারে এ-কথা কে না জানে? কিন্তু ইয়াংকিদের মতো পারে না অমন।'

'ঠিক বলেছো। তা ছাখো, তোমাকে আমার সার্কাসের দলে ক্লাউন ক'রে রাখতে পারি। রাজি? আহা-হা, রাগ কোরো না। ফ্রান্সের সার্কাসে তারা অন্য দেশের লোককে ক্লাউন সাজায়। কিন্তু বিদেশে বেরোলে ফরাশিকেও ক্লাউন সাজতে হয়।'

'এখন তো তাই দেখতে পাচ্ছি।'

'গায়ে জোর আছে তো?'

'খেতে পেলেই আমার গায়ে জোর হয়।'

'গান গাইতে জানো?—জানো বলছো? এ-গান কিন্তু যেমন-তেমন গান নয়—মাটিতে মাথা রেখে পা-তুটো উপরের দিকে তুলতে হবে; বাঁ-পায়ের তলায় ঘুরবে একটা লাটিম আর ডান পায়ে থাকবে একটা তলোয়ার—সেই অবস্থায় গান গাইতে হবে। পারবে?'

'ওসব কিছু-কিছু জানা আছে বৈকি!'

'ঠিক হ্যায়। রাজি থাকলে ঢুকে পড়ো আমার দলে।'

তখুনি সার্কাসের দলে চাকরি নিলো পাসপার্তু। আশ্চর্য নাকের কশরৎ দেখবার জন্যে হুড়হুড় ক'রে টিকিট বিক্রি হচ্ছে, চারদিক লোকে লোকারণ্য, মাঝে-মাঝে অর্কেস্ট্রা বাজছে,—শিগগিরই সার্কাস শুরু হ'য়ে গেলো।

পৃথিবীর মধ্যে ভালো ম্যাজিশিয়ান ও সার্কাসওয়ালা ব'লে জাপানিদের সুনাম আছে। রকম-বেরকম অদ্ভুত খেলা দেখে সেই জনারণ্য যখন বিস্ময়ে হতবাক, তখুনি আশ্চর্য নাকের কশরৎ শুরু হ'লো।

মধ্যযুগোচিত পোশাকে সেজে-গুজে ডানাওয়ালা জন-কয়েক সার্কাসের লোক স্টেজে এসে দাঁড়ালো। তাদের বড়ো-বড়ো নাক স্টেজে এক অভিনব দৃশ্যের সৃষ্টি করলো: কারো আট হাত লম্বা নাক, কারো বা চার হাত, কারো বা পাঁচ হাত। সেই নাকগুলোর মধ্যে আবার নানান রঙ মাখানো। নাকগুলো বাঁশের তৈরি। কয়েকজন অদ্ভুত-পোশাক-পরা লোক এসে নাকওয়ালাদের নাকের উপর নানান রকম খেলা দেখাতে লাগলো লাফ-ঝাঁপ দিয়ে।

আরো পঞ্চাশ জন দীর্ঘনাসা লোক এসে হাজির হ'লো নাকের পিরামিড তৈরি করবার জন্যে। পাসপার্তুত ছিলো এই দলে। এভাবে নাক লাগাতে ইচ্ছে ছিলো না তার, কিন্তু গত্যন্তর না-দেখে রাজি হ'তে হয়েছিলো তাকে। সেই বিরাট নাক নিয়ে ক-জন স্টেজের উপর শুয়ে পড়লো—তাদের নাকের উপর শুলো আবার আরো কয়েকজন,—এদের নাকের উপরও আবার আর-একদল শুলো। এভাবে সেই নাকের পিরামিড উঠতে লাগলো উঁচুতে। এভাবে উঠতে-উঠতে পিরামিডের চুড়ো স্টেজের শামিয়ানা ছুঁলো। দর্শকরা তো আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে ঘন-ঘন হাততালি দিতে লাগলো, আর সঙ্গে-সঙ্গে তীব্র শব্দে বেজে উঠলো অর্কেস্ট্রা।

হঠাৎ সবাই সচমকে তাকিয়ে দেখলে, সেই নাকের পিরামিড কেঁপে উঠছে। দেখা গেলো সব-নিচের দলের একজনের নাক গেলো খুলে। অমনি সেই পিরামিড ভেঙে চুরমার হ'য়ে গেলো—সার্কাসের লোকেরা কে কোথায় ছিটকে প'ড়লো কে জানে

বিভ্রাটটা ঘ'টলো পাসপার্তুতের দোষেই কিন্তু। হুড়মুড় ক'রে সেই গণ্ডগোলের মধ্যে থেকে কোনো রকমে বেরিয়ে পাসপার্তুত একলাফে ফুট-লাইট পেরিয়ে দৌড়ে গিয়ে দর্শকদের মধ্যে একজনের পায়ের কাছে বসে প'ড়লো। রুদ্ধস্বরে বললে: 'মাপ করুন, মাপ করুন আমায়!'

'একি, পাসপার্তুত যে!'

'হ্যাঁ, আমি।'

'যাও, এখুনি জাহাজে ওঠো।' পাসপার্তুত তখুনি ফিলিয়াস ফগ ও আউদার সঙ্গে থিয়েটার ছেড়ে বেরিয়ে এলো।

ফটকের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলো সার্কাসের মালিক বাটুলকার। রাগে, আক্রোশে ফুঁশছিলো সে। এভাবে পিরামিড ভেঙে দেবার জন্যে পাসপার্তুতকে আটকে তার কাছে ক্ষতিপূরণ চাইলো সে। ফিলিয়াস ফগ দ্বিরুক্তি না-ক'রে বাটুলকারের সামনে একতাড়া নোট ফেলে তখুনি সেখান থেকে বেরিয়ে আমেরিকা-গামী ডাক-জাহাজ 'এস. এস. জেনারেল গ্রাণ্ট'-এ গিয়ে উঠলেন।...

সাংহাই বন্দরে কী ঘটেছিলো পাঠক নিঃসন্দেহে তা সহজেই অনুমান করতে পেরেছেন। তংকাদিরির কামানের শব্দ শুনে ডাক-জাহাজ থামে। ফগ বুন্‌স্‌বিকে প্রচুর টাকাকড়ি দিয়ে সেই জাহাজে উঠেন, আর চোদ্দোই নভেম্বর পৌঁছোন ইয়োকোহামা।

ইয়োকোহামায় পৌঁছেই 'কর্নাটিক' জাহাজে খবর নিয়ে শোনা গেলো, জাঁ পাসপার্তুত ব'লে এক ফরাশি সেই জাহাজেই ইয়োকো-হামা এসেছে। সেদিন রাত্রেই ফগের সানফ্রান্সিসকো রওনা হওয়ার কথা। ফগ ইয়োকোহামার কন্সাল আপিশে গিয়ে পাসপার্তুতের খোঁজ নিলেন। হঠাৎ যদি দেখা হ'য়ে পড়ে, সে-জন্যে অনেক ঘুরলেন শহরের রাস্তায়। অনেক খোঁজ ক'রেও যখন তার কোন খোঁজ পাওয়া গেলো না, তখন জাহাজে ফেরার পথে সার্কাসের তাঁবুর সামনে ভিড় দেখে সার্কাস দেখতে ভিতরে ঢুকলেন। পাসপার্তুত যে সার্কাসের দলে ভিড়ে বসতে পারে, স্বপ্নেও তা ভাবেননি ফগ।

তারপর খেলা দেখতে-দেখতে অদূরে দর্শকদের মধ্যে ফগ ও আউদাকে দেখে পাসপার্তুত চঞ্চল হ'য়ে উঠে কী কাণ্ড ক'রে বসলো, তা পাঠক আগেই জেনেছেন।

...আউদার কাছ থেকে ফগের সমুদ্র-পাড়ির কাহিনী শুনলো পাসপার্তুত। আরো শুনলো যে, ফিক্স নামে এক ইংরেজ ভদ্রলোকও

ফগের সঙ্গে ইয়াকোহামা এসেছেন। ফিক্সের নাম শুনে বিন্দুতিল চঞ্চল হ'লো না পাসপার্তুত। ভাবলো, ঠিক সময়ে একবার বাগে পেলে ফিক্সকে সে শিক্ষা দেবে, আর তখন তার ভিতরের কথা ফাঁস ক'রে দেবে। নিজের কথা বলবার সময় সে সব গোপন ক'রে গিয়ে বললো যে, চণ্ডু খেয়ে অচৈতন্য হ'য়ে পড়েছিলো ব'লে তার এতো দুর্দশা ঘটেছে। ফগ সব দেখেশুনে তাকে জামা-কাপড় কেনবার জন্যে কিছু টাকা দিয়ে দিলেন।

বলা বাহুল্য, ফিক্সও 'জেনারেল গ্র্যাণ্ট' জাহাজে ছিলেন। ইয়োকোহামা পৌঁছেই তিনি দেখতে পেলেন, তাঁর সেই প্রত্যাশিত ওয়ারেণ্ট বিলেত থেকে এসেছে। কিন্তু তার জোরে ফগকে অ্যারেস্ট করবার কোনো উপায় ছিলো না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের এক্তিয়ারের বাইরে আসামীকে ধরতে হ'লে স্পেশ্যাল ওয়ারেণ্টের দরকার,—কিন্তু বিশেষ ব্যবস্থা করবার সময়ও তখন আর ছিলো না। ফিক্স ভাবলেন, 'যা হোক, ওয়ারেণ্ট তো পাওয়া গেলো—এখানে আর ওকে ধরা গেলো না বটে কিন্তু ইংল্যাণ্ডে যাওয়ামাত্রই ধ'রবো। তখন তাকে কে বাঁচাতে পারে দেখবো। এখন ফগ যাতে শিগগির বিলেত পৌঁছুতে পারেন তারই ব্যবস্থা করতে হবে।' এমনি সময় পাসপার্তুতকে দেখতে পেয়ে বিষম ভয় পেয়ে নিজের কেবিনে প্রস্থান করলেন তিনি। কিন্তু দুর্ভাগ্য সেই রাত্রিতেই তাঁকে পাসপার্তুতের কাছে এনে হাজির ক'রলো।

তাঁকে দেখেই কোনো কথা না ব'লে পাসপার্তুত সটান অনেকগুলো ঘুশি কশিয়ে দিলে। ফিক্স জাহাজের ডেকের উপর ছিটকে পড়লেন। নাবিক ও যাত্রীদের মধ্যে অনেকে চারদিকে দাঁড়িয়ে হো-হো ক'রে হাসতে লাগলো। ফিক্স তখন কাতর কণ্ঠে বললেন: 'আর কেন পাসপার্তুত, ঢের হয়েছে।' তখন পাসপার্তুত তাঁকে ছেড়ে দিয়ে বললে: 'হ্যাঁ, আপাতত হয়েছে বটে।'

'এসো তবে, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।' ফিক্স বললেন,

'আমি এখন যা বলবো তা ফিলিয়াস ফগের ভালোর জন্যেই।'

জাহাজের এক কোণে পাসপার্তুকে ডেকে নিয়ে ফিক্স বলতে লাগলেন: 'তুমি আমার উপর একহাত নিয়ে নিয়েছো, বেশ করেছো। এমনধারা যে হবে, তা আমার জানাই ছিলো। কিন্তু আমার কথাগুলো একবার মন দিয়ে শোনো। এতোদিন পর্যন্ত আমি ওঁর বিপক্ষে ছিলুম, কিন্তু এখন থেকে ওঁর বন্ধু,—যদিও আমার এখনো দৃঢ় বিশ্বাস উনিই দস্যু। আরে, অতো উত্তেজিত হ'য়ে উঠো না। যা বলি, শোনো। যতোদিন ফগ ব্রিটিশ এলাকায় ছিলেন ততোদিন আমি ওঁকে অ্যারেস্ট করতে অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু এখানে ওঁকে কোনো রকমেই গ্রেপ্তার করতে পারবো না। মনে হচ্ছে ফগ এখন বিলেতে ফিরবেন। আমিও তাঁর অনুসরণ করবো। তিনি যাতে নির্বিঘ্নে বিলেতে যেতে পারেন, আমাকে সে-চেষ্টাই করতে হবে এখন। বিলেতেই জানা যাবে ফগ দোষী কি নির্দোষ। ততোদিন তোমার মতো আমিও তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী।'

ফিক্স এমনভাবে কথাগুলো বললেন যে পাসপার্তুর কতোকটা বিশ্বাস হ'লো। ফিক্স শুধোলেন: 'কেমন? তবে আমরা আজ থেকে বন্ধু?'

'বন্ধু? কক্ষনো না!' চেঁচিয়ে উঠলো পাসপার্তু। 'তবে, আমরা আজ থেকে ফগের শুভাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু এ-কথা মনে রাখবেন, যে-মুহূর্তে দেখবো আপনি তাঁর অনিষ্ট করবার চেষ্টা করছেন, সেই মুহূর্তেই আপনাকে ছিঁড়ে ফেলবো! এ-কথা যেন মনে থাকে!'

'তাই হবে'—ব'লে ফিক্স বিদায় নিয়ে নিজের কেবিনে ফিরে গেলেন।

'এস. এস. জেনারেল গ্র্যান্ট' খুব দ্রুতগামী জাহাজ। ফগ হিশেব ক'রে দেখলেন যে, তিনি দোশরা ডিসেম্বর সানফ্রান্সিসকো, এগারোই নিউ ইয়র্ক, আর বিশ তারিখে লণ্ডন পৌঁছতে পারবেন।

আবহাওয়া চমৎকার ছিলো ব'লে 'জেনারেল গ্র্যান্ট' দ্রুতবেগে

সানফ্রান্সিসকোর দিকে এগিয়ে চললো। বলবার মতো বিশেষ কিছুই জাহাজে ঘটলো না। যা-কিছু ঘটছিলো, তা আউদার মনে।

ক্রমশই ফগের দিকে আউদার হৃদয় আকৃষ্ট হচ্ছিলো। সে আকর্ষণের কারণ শুধু কৃতজ্ঞতা ব'লে নির্দেশ করলে ভুল করা হবে।

দশ ইয়াংকিদের হালচাল

যথাসময়ে 'জেনারেল গ্র্যান্ট' সানফ্রান্সিকোয় এসে নোঙর ফেললো। তখন সকাল। ফগ আমেরিকার মাটিতে পদার্পণ ক'রেই শুনলেন, নিউ ইয়র্কের ট্রেন সন্ধ্যার সময় ছাড়বে। তাঁরা একটা হোটেলে উঠলেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হোটেলটায় কোনো জিনিশেরই অভাব ছিলো না। প্রাতরাশের পর আউদাকে নিয়ে ইংরেজ কন্সালের আপিশে গেলেন পাসপোর্ট সই করিয়ে নিতে।

পাসপার্তু বললে: 'শুনেছি আমেরিকার রেলপথে দস্যু-ডাকাতের বড়ো ভয়। তারা চলতি ট্রেনেই লুঠ-তরাজ করে। গোটাকতোক রিভলভার কিনে নিলে হয় না?'

ফগ বললেন: 'ইচ্ছে হয় তো কিনতে পারো। পথে হয়তো কোনো দরকারই হবে না।'

রাস্তায় ফগের সঙ্গে ফিক্সের দেখা হ'য়ে গেলো। তাঁকে দেখেই ফগ বললেন: 'আশ্চর্য! আমরা এক জাহাজেই এসেছি, অথচ আপনার সঙ্গে একবারো দেখা হয়নি জাহাজে!'

ফিক্স আগের কথা উল্লেখ ক'রে কৃতজ্ঞতা জানালেন। বললেন: 'আপনার সঙ্গে ভ্রমণ করা রীতিমতো সৌভাগ্যের কথা। আমিও কাজের খাতিরে য়ুরোপে যাচ্ছি। আপনার আপত্তি না-থাকলে আমরা একসঙ্গেই যেতে পারি।'

'সে কী কথা! আপনার সঙ্গে ভ্রমণ করা তো আমারই সৌভাগ্যের বিষয়! বেশ তো, আমরা একসঙ্গেই য়ুরোপ যাবো।'

ফিক্সের মতলব সিদ্ধ হ'লো।

মণ্টগোমেরি স্ট্রীট দিয়ে যাচ্ছিলেন ওঁরা। সামনেই দেখলেন লোকে লোকারণ্য। সে জনারণ্য ভেদ ক'রে সামনে এগোনো অসম্ভব। সেখানে কেউ-বা চীৎকার করছে, কেউ বা বড়ো-বড়ো পোস্টার নিয়ে ছুটোছুটি করছে, কোথাও উড়ছে ঝাণ্ডা, কোথাও-বা অনেকে চেঁচিয়ে উঠছে, 'ক্যামেরফিল্ড জিন্দাবাদ,' কেউ-বা বলছে, 'মণ্ডিবয় জিন্দাবাদ।'

ফিক্সের মনে হ'লো, এ নিশ্চয়ই কোন রাজনৈতিক সভা। তাই তিনি বললেন: 'আসুন আমরা স'রে পড়ি। এখানে দাঁড়ালে বিপদ ঘটতে পারে।'

ফগও সায় দিলেন তাঁর কথায়। কিন্তু তখন অন্যদিকে যাওয়ার আর কোনো উপায় ছিলো না। রাস্তার এক কিনারে স'রে এসে তাঁরা সেখান থেকে স'রে পড়বার সুযোগ খুঁজতে লাগলেন। চারদিক দেখে-শুনে ফগ ভাবলেন, হয়তো আমেরিকার ন্যাশনাল কাউন্সিলের সভাপতি নির্বাচন, নয়তো কোনো প্রাদেশিক শাসনকর্তা মনোনয়নের জন্যেই এই সভা ডাকা হ'য়েছে।

ক্রমশই কোলাহল বেড়ে উঠছিলো বটে, হঠাৎ যে দাঙ্গা শুরু হ'য়ে যেতে পারে কেউই সে-কথা ভাবতে পারেন নি। দেখতে-দেখতে সেই জনারণ্যের কোলাহল গেল বেড়ে, শুরু হ'লো ঘুশোঘুশি, লাঠালাঠি। রিভলভারের শব্দও কানে এলো। দাঙ্গা ক্রমশ গুরুতর আকার ধারণ ক'রলো দেখে তাঁরা স'রে পড়বার উদ্যোগ করছেন, এমন সময় এক সবলদেহ ইয়াংকি ফগের মাথা লক্ষ ক'রে লাঠি ওঠালো। ফিক্স যদি নিজের দেহে সে-আঘাত না নিতেন, তাহ'লে হয়তো ফিলিয়াস ফগ সাংঘাতিক আহত হতেন। লাঠির ঘায়ে ফিক্সের টুপি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেলো।

অসহ্য ঘৃণায় ফেটে পড়লেন ফগ : 'কী নীচ এই ইয়াংকিটা !'

লাল দাড়িতে হাত বুলিয়ে আমেরিকানটি বললে : 'ওরে ইংরেজ, মনে থাকে যেন আবার আমাদের দেখা হবে !'

'ঠিক হ্যায় ! যখন ইচ্ছে তোমার সঙ্গে মোলাকাত করতে রাজি।'

'তোমার নাম কী ?'

'ফিলিয়াস ফগ। তোমার ?'

'কর্নেল স্ট্যাম্প প্রক্টর।'

উন্মাদ জনারণ্যের কোলাহলে ও ধাক্কাধাক্কিতে কর্নেল প্রক্টরের সঙ্গে ফগের ছাড়াছাড়ি হ'য়ে গেলো তখনকার মতো।

কী ক'রে যে আউদাকে নিয়ে ফগ আর ফিক্স হোটেলে জীবন্ত ফিরতে পারলেন, তা তাঁরা নিজেরাই জানেন না। পোশাক-আশাকের যে-দুর্দশা হয়েছিলো তাতে হোটেলে ফিরে সকলকেই নতুন পোশাক কিনতে হ'লো।

পাসপার্তু আগেই বারোটা অটোমেটিক রিভলভার ও প্রচুর কার্তুজ নিয়ে হোটেলে ফিরেছিলো। ফিক্সকে দেখেই তার ভুরু কুঁচকে গেলো। কিন্তু সে যখন শুনলো যে তাঁর জন্যেই ফগ আহত হ'তে-হ'তে বেঁচে গেছেন, তখন সে অনেকটা শান্ত হ'লো। দেখলো যে ফিক্স তাঁর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ করেছেন।

সান্ধ্য ভোজন শেষ ক'রে সবাই স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে উঠলেন। ট্রেনে উঠতে-উঠতে ফগ বললেন : 'সেই ইয়াংকিটার সঙ্গে আর দেখা হ'লো না। ইংরেজকে অপমান করার প্রতিশোধ নিতে আবার তার খোঁজে আমাকে এ-দেশে আসতে হবে।'

এ-কথা শুনে ফিক্স মনে মনে হাসলেন। ভাবলেন, 'একবার ইংল্যাণ্ডে গেলে হয়, তারপর আর তোমাকে ফিরতে হবে না ! আমি নইলে সঙ্গে আছি কেন ?'

স্টেশনের একটি লোককে দেখে ফগ শুধোলেন : আজ অতো গোলমাল হ'লো কিসের ?'

'একটা সভা হচ্ছিলো।'

'কোনো সেনাপতি মনোনীত হচ্ছিলেন বুঝি?'

লোকটি উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো। 'না, না। সেনাপতি নির্বাচন! ও কি আর যে-সে কথা! এ সভায় একজন সাধারণ বিচারক মনোনীত হচ্ছিলেন।'

আর কোনো কথা জিজ্ঞেস করা গেলো না। ট্রেন ছেড়ে দিলো। নিউইয়র্ক থেকে সানফ্রান্সিসকো পর্যন্ত রেল-লাইন তিন হাজার সাতশো ছিয়াশি মাইল লম্বা। এই সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে একদা কম করেও ছ-মাস লাগতো—সেই ছ-মাসের পথ এখন এক হপ্তায় দাঁড়িয়েছে।

যে-ট্রেনে ফগরা উঠলেন, সেই ট্রেনে ড্রয়িং রুম, স্মোকিং রুম, খাবার ঘর সবকিছুই ছিলো। চলতি ট্রেনেই এক কামরা থেকে অন্য কামরায় যাওয়া যেতো। বই-পত্র, খাবার-দাবার কোনো কিছুরই অভাব ছিলো না ট্রেনে। সঙ্গে-সঙ্গে একটা ছোট্টো প্রেসও ছিলো। সেই প্রেসে ছাপা হ'য়ে খবরের কাগজ পর্যন্ত বেরোতো। ট্রেনের সীটগুলো এমন কৌশলে তৈরি ছিলো যে, স্প্রিং টিপলেই তার পিছনের অংশ খুলে আসতো, বেরিয়ে পড়তো চমৎকার বিছানা—ধবধবে ও নরম। যে-গাড়িতে যতগুলো বিছানা, সেই গাড়িতে তার চেয়ে বেশি যাত্রী থাকবার নিয়ম ছিলো না।

কয়েক দিন ধ'রে নির্বিঘ্নেই ট্রেন চললো। সাতই ডিসেম্বর ভোরবেলা গ্রীন রিভার স্টেশনে এসে ট্রেন থামলো। গত রাত্রে প্রচুর বরফ পড়েছিলো, তার জের সকাল বেলায়ও কাটেনি। পাসপার্তু ঠাণ্ডায় কাঁপতে-কাঁপতে ভাবছিলো, 'এ সময়েও লোকে দেশ-ভ্রমণে বেরোয়! আর-একটু বরফ পড়লেই তো ট্রেন চলতে পারতো না!'

ট্রেন থামবার সঙ্গে-সঙ্গে অনেকেই নামলো। হঠাৎ আউদা এক ভদ্রলোককে দেখে ভয়ে আঁৎকে উঠলেন। ভদ্রলোক আর কেউ নন,

—কর্নেল প্রক্টর, যিনি 'আবার দেখা হবে' ব'লে ফিলিয়াস ফগকে শাসিয়েছিলেন। ফগ তখনো ঘুমোচ্ছিলেন। কর্নেলকে দেখে একটা বিপদের আশঙ্কায় আউদার মন এতো বিচলিত হ'য়ে পড়লো যে তিনি ফিক্স আর পাসপার্তুতকে কর্নেলের কথা বললেন।

ফিক্স বললেন: 'কোনো ভয় নেই আপনার, কিছু ভাববেন না। কর্নেলকে সব-আগে আমার সঙ্গে বোঝা পড়া করতে হবে। আমিই তো তার হাতে বেশি অপমানিত হয়েছি।'

পাসপার্তুতও দাঁত কিড়মিড় ক'রে বললে: 'ও-সব কর্নেলকে থোড়াই কেয়ার করি আমি! আমার সঙ্গেও তার অল্প-বিস্তর হিসেব-নিকেশ আছে।'

এদের কথা শুনে শান্ত হ'তে পারলেন না আউদা। বললেন: 'মিস্টার ফিক্স, আপনি কি জানেন না যে মিস্টার ফগ আর কাউকেই তাঁর কলহ ঘাড়ে নিতে দেবেন না! তিনি তো বলেছেন যে তাঁকে অপমান করেছে তার সঙ্গে বোঝাপড়া করবার জন্যে আবার আমেরিকায় আসবেন। যদি তাঁর সঙ্গে কর্নেলের এখনি দেখা হয়, না-জানি কী একটা বিষম কাণ্ড ঘটবে! দু-জনের মধ্যে যাতে দেখা না হয়, আপনারা তারই ব্যবস্থা করুন।'

ফিক্স বললেন: 'আপনার কথাই ঠিক। দেখা হ'লেই সব পণ্ড হবে। মিস্টার ফগ জিততে পারুন আর না পারুন, তাঁর দেরি হ'লে—'

ইশারায় তাঁকে চুপ করতে ব'লে পাসপার্তুত বললে: তাঁর দেরি হ'লে রিফর্ম ক্লাবের একটা মস্ত সুবিধে জুটে গেলো আর-কি! নিউ ইয়র্ক যেতে এখনো আমাদের চারদিন বাকি। যদি মিস্টার ফগ এর মধ্যে গাড়ি থেকে না নামেন, তাহ'লেই কর্নেলের সঙ্গে তাঁর আর দেখা হবে না। যে-ক'রেই হোক, তাঁদের যাতে দেখা না হয়, সে ব্যবস্থা করতেই হবে।'

এমন সময় ফগের ঘুম ভাঙলো দেখে সবাই চুপ ক'রে গেলেন।

শুধু নিচু গলায় ফিক্স পাসপার্তুকে বললেন: 'মিস্টার ফগকে জীয়ন্ত বিলেতে নিয়ে যেতে যা-কিছু করা সম্ভব, আমি তাই করবো।'

ফগ যাতে গাড়ি থেকে না নামেন তারই ব্যবস্থা করবার জন্যে ফিক্স তাঁকে বললেন: 'সময় যেন আর কাটতে চায় না। একটু হুইস্ট খেললে মন্দ হ'তো না।'

ফগ বললেন: 'খেলার সঙ্গী আর তাস পাওয়া গেলে সত্যিই বেশ হ'তো।'

'তাস তো এখুনি আনতে পারা যায়। ট্রেনেই কিনতে পাওয়া যাবে। আর, খেলার সঙ্গী? যদি মিসেস আউদা খেলেন—'

আউদা বললেন: 'আমি অল্পসল্প জানি।'

'আমিও একটু খেলতে পারি।'

ফগ খুশি হ'য়ে বললেন: 'বেশ তো।'

পাসপার্তু তক্ষুনি তাস কিনে আনলো।

ট্রেন নির্বিবাদে এগিয়ে চললো। ফগ নিশ্চিন্ত মনে হুইস্ট খেলতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ফগ খেলায় এতো জ'মে গেলেন যে, পথের মধ্যে হঠাৎ যখন ট্রেন থেমে গেলো, সেদিকে খেয়ালও করলেন না।

হাতে কোনো কাজ ছিলো না ব'লে পথের মধ্যে হঠাৎ কেন ট্রেন থেমে গেলো, সে-খবর নেয়ার জন্যে পাসপার্তু গাড়ি থেকে নামলো। অনেকেই ট্রেনের গার্ডকে ঘিরে ধ'রে নানান প্রশ্ন করছিলো। কর্নেল প্রক্টরও ছিলেন এদের মধ্যে।

মেডিসিন-বো স্টেশনের স্টেশন-মাস্টার একটা লোক পাঠিয়ে খবর দিয়েছিলো যে, সামনের একটা সেতু নিরাপদ নয়, তার উপর দিয়ে ট্রেন চলতে পারবে না। গার্ড বললে যে, এই খবর পেয়েই সে গাড়ি থামিয়েছে। যেখানে ট্রেনটা থেমেছিলো, তাই মাইল-খানেক দূরে ছিলো ব্রিজটা। ব্রিজটার তলা দিয়ে একটা পাহাড়ে নদী তীব্রবেগে ছুটে চলেছিলো। জানা গেলো, ব্রিজটার কয়েকটা থাম ভেঙে গেছে।

খবর শুনে পাসপার্তুতের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। ফগকে এই দুঃসংবাদ দেয়ার সাহস তার হ'লো না। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রুদ্ধনিশ্বাসে সে আরোহীদের আলোচনা শুনতে লাগলো।

কর্নেল প্রক্টর বললেন: 'বাঃ! বেড়ে মজা দেখছি! আমরা কি তবে এই বরফের মধ্যে অনন্তকাল দাঁড়িয়ে থাকবো?'

গার্ড জবাব দিলো: 'না, আমি আরেকটা ট্রেনের জন্যে ওমাহা স্টেশনে তার পাঠিয়েছি। কিন্তু ছ-ঘণ্টার আগে সে-গাড়ি মেডিসিন-বো স্টেশনে আসতে পারবে না। এদিকে এক মাইল পথ হ'লেও ছ-ঘণ্টার আগে হেঁটেও যাওয়া যাবে না। নদী পার হ'তে হবে তো! নৌকোয় পার হওয়া এখন অসম্ভব। পাহাড়ে বৃষ্টি হচ্ছে। নদী এতো ফুঁশে উঠেছে, নৌকোর সাধ্যি নেই সাঁকোর কাছে পার হয়। পার হবার একটাই ঘাট আছে। সেও আবার দশ মাইল দূরে।'

যাত্রীদের মধ্যে তখন একটা শোরগোল উঠলো। ফগ যদি খেলায় মেতে না থাকতেন, তবে তিনিও নিশ্চয়ই গাড়ি থেকে নামতেন।

ড্রাইভার তখন বললে: 'একটা উপায় অবশ্যি আছে—একবার চেষ্টা ক'রে দেখলে হয়। হ্যাঁ, সাঁকো পেরোবার কথাই বলছি।'

'ট্রেনখানা সমেত নাকি?'

'হ্যাঁ, সেই কথাই বলছি।'

গার্ড বললে: 'পাগল হয়েছো? সাঁকো যে ভেঙে গেছে!'

'তা ভাঙলোই বা, প'ড়ে তো আর যায় নি! গোটা-দুই থাম ভেঙেছে মাত্র। আমি যদি খুব স্পীডে গাড়ি চালিয়ে দিই, তবে পলক ফেলতে-না-ফেলতে ট্রেন নিয়েই সাঁকো পেরিয়ে যেতে পারবো।'

ড্রাইভারের কথা শুনে তো পাসপার্তুতের আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া! কিন্তু কথাটা অনেকেরই মনে ধরলো। কর্নেল প্রক্টর বললেন: 'এ আর বেশি কথা কী! এ তো হ'তেই পারে। এখানে তো তবু সাঁকোটা দাঁড়িয়ে আছে, ভেঙে পড়েনি। আমি এক ড্রাইভারকে

জানি, যে বিনা সাঁকোতেই একবার একটা ছোটো নদী পার ক'রে ট্রেন নিয়ে গিয়েছিলো। সে তখন কী সাংঘাতিক স্পীডে গাড়ি চালিয়েছিলো, তা আর বলা যায় না। গোটা ট্রেনখানা লাইন থেকে যেন লাফিয়ে উঠে নদী পেরিয়ে গেলো। আমাদের ট্রেন তো সাঁকোর উপর দিয়ে যাবে।'

একথা শুনে অনেকেই ড্রাইভারের পক্ষ সমর্থন ক'রলো। একজন বললে: 'আমরা যে নির্বিঘ্নে যেতে পারবো, তার শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সম্ভাবনা।'

আর-একজন অমনি ব'লে উঠলো: 'পঞ্চাশ ভাগ কী হে, ষাট ভাগ।'

কর্নেল প্রক্টর বললেন: 'তোমাদের একটা আন্দাজ নেই! যেখানে আশি-নব্বই ভাগ সম্ভাবনা সেখানে ষাট ভাগ বলছো!'

ইয়াংকিদের হালচাল দেখে পাসপার্তুতের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হ'লো। এমন সময় একটু নিরাপদ একটা উপায় তার মনে এলো। সে বললো: 'আমি বলছিলুম কী—এই বিপজ্জনক—'

তার কথা কেড়ে নিয়ে একটি লোক বললে: 'পার হবার আশি ভাগ সম্ভাবনা যেখানে দেখা গেলো, তা আবার বিপজ্জনক কী? ড্রাইভার নিজে বলছে যেতে পারবে।'

'তা পারতে পারে। কিন্তু আমি যা বলছিলুম সেইটেই বোধহয় ঠিক হ'তো।'

'ঠিক!' কর্নেল প্রক্টর রেগে উঠলেন। 'ঠিক আবার কী! তুমি কি বুঝতে পারছো না যে আমরা ফুল স্পীডে চালিয়ে যাবো? শুনলে? ফুল স্পীডে।' তারপর বিদ্রূপ ফেটে পড়লেন—

'কী হে ছোকরা, ভয় পেয়েছো নাকি?'

'ভয়? ভয় কাকে বলে পাসপার্তু জানে না!'

গার্ড বললে: 'উঠুন, উঠুন—সবাই গাড়িতে উঠুন। গাড়ি এখুনি ছাড়বে।'

পাসপার্তু নিচু গলায় বললো: 'তা না-হয় উঠছি কিন্তু যাত্রীরা হেঁটে সাঁকো পেরোলে পর গাড়ি সাঁকোর উপর তুললে ভালো হ'তো।' কিন্তু তার যুক্তি কেউ শুনলো না,—শুনলেও মানতে চাইতো কি না সন্দেহ।

সবাই গাড়িতে উঠলো। ফগ তখনো একমনে হুইস্ট খেলছিলেন। ড্রাইভার সিটি দিয়ে ট্রেনখানি এক মাইল পেছনে নিয়ে গেলো। সেখান থেকে এগোলো প্রচণ্ড বেগে। ঘণ্টায় একশো মাইলের কম হবে না সে স্পীড। ট্রেন যেন রেললাইন না-ছুঁয়েই ছুটলো! বিদ্যুৎ যেমন ক'রে চক্ষের পলকে আকাশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত স্পর্শ করে, ট্রেনটাও তেমনি নিমেষের মধ্যে সাঁকো পেরিয়ে গেলো। সবাই তাকিয়ে দেখলো, সাঁকোটা টুকরো-টুকরো হ'য়ে প'ড়ে যাচ্ছে নদীতে।

ট্রেন এগিয়ে চললো।···

ট্রেনে তিন দিন তিন রাত কেটে গেছে। এই সময়ের মধ্যে তেরোশো বিরাশি মাইল পেরিয়েছে ট্রেন। ইভান্স পাস স্টেশন ছাড়িয়ে সন্ধের পর ট্রেন ক্রমশ নিচের দিকে ছুটে চললো।···

সকাল বেলা ফগ হুইস্ট খেলতে শুরু করলেন। ফিক্সও হুইস্টে রীতিমতো ওস্তাদ। অল্পক্ষণের মধ্যেই খেলা জ'মে উঠলো। সেবার ফগের পালা। যেই ফগ একটা চিড়েতন খেলতে যাবেন, অমনি কে যেন পিছন থেকে ব'লে উঠলো: 'আমি হ'লে হরতন খেলতুম।' সবাই চমকে তাকিয়ে দেখলো, পেছনে কর্নেল প্রক্টর। ফগকে দেখেই কর্নেল বললেন: 'আপনি আমার সেই পুরোনো ইংরেজ-বন্ধু! তাই তো বলি, ইংরেজ না-হ'লে গর্দভের মতো চিড়েতন খেলে কে!'

'ঠিক তাই। দেখুন না, আমিও খেলছি তাই।' ফগ তাশ দিলেন।

তাশটা তুলে নেয়ার চেষ্টা করতে-করতে দুঃসহ স্পর্ধায় কর্নেল বললেন: 'আমি হরতন খেলতে চাই। আপনি হুইস্ট খেলার কিছুই জানেন না দেখছি।'

ফিক্সও দস্যুর পশ্চাদ্ধাবন করবার জন্যে সেই ট্রেনেই যাবেন ব'লে ঠিক করেছিলেন, কিন্তু পাসপার্তুতের কাহিনী শুনে মত পাল্টে ভাবলেন, দেখা যাক কী হয়। ঠিক সেই মুহূর্তে হুইসল দিয়ে বোম্বাই মেল কলকাতা যাত্রা করলো।

যে-গাড়িতে ফিলিয়াস ফগ পাসপার্তুতকে নিয়ে উঠেছিলেন, সেউ গাড়িতেই জেনারেল স্যর ফ্রান্সিস কোমার্ট ছিলেন। মংগোলিয়া জাহাজে এঁর সঙ্গেই হুইস্ট খেলতেন ফগ। স্যর ফ্র্যান্সিসের জীবনের বেশিরভাগই কেটেছিলো ভারতবর্ষে। ইতিপূর্বেই ফগের পাগলামো লক্ষ করেছিলেন ভদ্রলোক। তাঁর রকম-সকম দেখে অনেক সময় স্যর ফ্র্যান্সিসের সন্দেহ হ'তো, বুঝি এই রক্তমাংসের শরীরের মধ্যে প্রাণ নেই—যে মন প্রকৃতির অফুরন্ত লীলা-সুন্দর রূপ দেখবার জন্য ব্যাকুল, সেই মন বোধহয় নেই ফিলিয়াসের শরীরে। জীবনে অনেক লোক দেখেছেন স্যর ফ্র্যান্সিস, কিন্তু ফগের মতো লোক আর কখনো দেখেন নি।

ট্রেন যেমন চলছিলো, তেমনি চললো। দেখতে-দেখতে পেরিয়ে গেলো পশ্চিমঘাট গিরিমালার সুড়ঙ্গ-পথ।

কথা-প্রসঙ্গে স্যর ফ্রান্সিস বললেন: 'আর কিছুদিন আগে হ'লে আপনাকে বিফল-মনোরথ হ'তে হ'তো, আশি দিনে সারা দুনিয়া ঘুরে আসা সম্ভব হ'তো না। কারণ, তখন পশ্চিমঘাট পর্বতমালার পাদদেশ পর্যন্তই চলতো রেল—তার পর আর লাইন ছিলো না। তখন সেখান থেকে পাল্কিতে কিংবা ঘোড়ায় করে যেতে হ'তো।'

'ওসব সামান্য বাধায় আমার অসুবিধে হ'তো না। পথ চলতে গেলে মাঝে-[illegible] বিঘ্ন এসে হাজির হবে, সেটা তো জেনেশুনেই বেরিয়েছি।'

'আজকেই [illegible] আপনার সব মাটি হতে বসেছিলো।' কম্বল মুড়ি দিয়ে [illegible] ঘুমোচ্ছিলো, তাকে দেখিয়ে স্যর ফ্র্যান্সিস বললেন, '[illegible] আজ যে-কাণ্ড বাধিয়ে বসেছিলো,

[illegible]

ব্রিটিশ-রাজত্বে সে অপরাধ খুব গুরুতর ব'লে গণ্য হয়। এদেশের লোকের ধর্মবিশ্বাসে যাতে আঘাত না লাগে, ইংরেজ সরকার সে-বিষয়ে খুব তৎপর। আজ যদি ও ধরা পড়তো—'

'তাহ'লে কী আর হ'তো? এদেশের আইন অনুসারে তার শাস্তি হ'তো। দুদিন পরেই সে আবার য়ুরোপে ফিরে যেতো। ওর জন্য কি আর আমি এখানে ব'সে থাকতাম? কক্ষনো না। একাই চ'লে যেতাম আমি।'

রাত বেড়ে চললো ক্রমশ। সকলে ঘুমিয়ে পড়লেন। ট্রেন যেমন তীরবেগে ছুটছিলো, তেমনি চললো।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙলো পাসপার্তুতের। ট্রেন আগের মতোই দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে। পাসপার্তু মনোযোগ দিয়ে চারদিকে দেখতে লাগলো। মল্লিনাথ, ইলোরা, ঔরংগাবাদ ছাড়িয়ে বেলা প্রায় সাড়ে বারোটার সময় বুরহানপুর স্টেশনে এসে ট্রেন থামলো। ঝুটো-মোতি-বসানো একজোড়া চপ্পল কিনে পাসপার্তু সগর্বে তার খালি-পা আবৃত করলো।

মালাবারের দুর্ঘটনার পর থেকেই পাসপার্তুতের মতি ফিরেছিলো। বোম্বাইয়ে আসবার আগে পর্যন্ত তার বিশ্বাস ছিলো, এই আজব ভ্রমণ সেখানেই শেষ হবে। কিন্তু ভারতবর্ষের সুন্দর দৃশ্যাবলী তার মনের ঘুমন্ত সঞ্চারী-স্পৃহাকে জাগিয়ে তুললো, যৌবনের উদ্দাম উন্মাদনা আবার ফিরে এলো তার মনে। এবার তার বিশ্বাস হ'লো যে ফিলিয়াস ফগের বাজি রাখার কাহিনী সম্পূর্ণ সত্য। যে-করেই হোক, আশি দিনের মধ্যে পৃথিবী ঘুরে আসতেই হবে। এবার ফিলিয়াস ফগের চেয়ে তার চিন্তাই বেশি হ'য়ে উঠলো। ঠিক সময়মতো যাওয়া যাবে তো? পথে তো কোনো বিপদ-আপদ ঘটবে না? কোনো কারণে দেরি হ'য়ে যাবে না তো? বাজি জিততে পারলে কতো গৌরব! বোম্বাইয়ে যে সে বোকামির জন্য সব নষ্ট হ'তে বসেছিলো, সে-কথা মনে ক'রে এখন তার বুক দুরু-দুরু করছে

লাগলো। কোনো স্টেশনে একটু বেশিক্ষণ ট্রেন দাঁড়ালেই বিরক্ত হ'য়ে উঠতে লাগলো সে। অবশেষে ট্রেনের ড্রাইভারের উদ্দেশে গালি পাড়তে শুরু করলো, আর মনে-মনে বলতে লাগলো : 'আমার মনিবও যেমন—ড্রাইভারকে কিছু দিলেই তো সে আরো বেগে গাড়ি চালাতো! পুরস্কার পেয়েই তো মংগোলিয়ার ক্যাপ্টেন প্রবল বেগে চালিয়েছিলো জাহাজ!'

বাইশে অক্টোবর সকাল আটটার সময় রোথাল থেকে পনেরো মাইল দূরে গাড়ি থেমে গেলো। গার্ড সাহেব চেঁচিয়ে বললে : 'নামো, নামো—গাড়ি থেকে নামো! এখানে গাড়ি বদল হবে।'

ফিলিয়াস ফগ এ-কথার মানে বুঝতে না-পেরে স্যর ফ্রান্সিসের মুখের দিকে তাকালেন। পাসপার্তু মুহূর্তমধ্যে নেমে গিয়ে খবর আনলে, ট্রেন আর চলবে না, পথ নেই।

স্যর ফ্রান্সিস বললেন : 'বলছো কী তুমি? ট্রেন আর চলবে না? এর মানে?'

'আমি বলছি যে, ট্রেন আর এক ইঞ্চিও যাবে না।'

ওর কথা শুনে ফিলিয়াস ফগ আর স্যর ফ্রান্সিস নামলেন। সামনে গার্ডকে দেখে স্যর ফ্রান্সিস শুধোলেন : 'আমরা কোথায় এসেছি?'

'খোলবি গাঁয়ে।'

'এখানে এতোক্ষণ দাঁড়ানোর কারণ কী?'

'ওদিকে এখনো রেল-লাইন তৈরি হয়নি।'

'তৈরি হয়নি? তার মানে?'

'এখান থেকে এলাহাবাদ পঞ্চাশ মাইল। এ-পঞ্চাশ মাইল এখনো লাইন বসানো হয়নি। এলাহাবাদ থেকে আবার ট্রেন পাওয়া যাবে।'

স্যর ফ্রান্সিস রেগে উঠেছিলেন। 'লাইন হয়নি তো বরাবর

কলকাতার টিকিট দেয়া হ'লো কেন? খবরের কাগজে যে লিখেছে লাইন বসানো হ'য়ে গেছে?'

'সে আমি কী করবো বলুন? সে হ'লো খবরের কাগজের দোষ। টিকিট তো সরাসরি কলকাতারই দেয়া হচ্ছে। এ তো সবাই জানে যে, যাত্রীরা নিজেদের ব্যবস্থামতো খোলবি থেকে এলাহাবাদ যায়।'

গার্ডের কথা শুনে স্যর ফ্রান্সিসের রাগ সীমা ছাড়ালো। যদি পারতো, তাহ'লে পাসপার্তু তক্ষুনি গার্ডকে উত্তম-মধ্যম শিক্ষা দিয়ে দিতো।

ফিলিয়াস ফগ বললেন: 'চলুন, স্যর ফ্রান্সিস। যে-ক'রেই হোক এলাহাবাদ তো যেতেই হবে। দেখা যাক, কোনো উপায় হয় কি না।'

'এখন আর কী ব্যবস্থাই-বা করা যাবে? যা দেখছি, তাতে মনে হয় আপনার বাজির এখানেই শেষ হবে।'

'ও কিছু না। ভাববেন না ও-জন্যে। দেরি যে কিছু হবে, সে আমি আগেই ভেবে দেখেছি।'

'সেকি?' সবিস্ময়ে স্যর ফ্রান্সিস বললেন: 'লাইন যে তৈরি হয়নি, সেটা কি তবে আগেই জানা ছিলো?'

'না, তা ছিলো না। তবে, আমার যাত্রাপথে যে অনেক বাধা-বিপত্তি এসে দাঁড়াতে পারে, সে সম্বন্ধে আমার কখনো সন্দেহ ছিলো না।'

'কলকাতার ট্রেন ধরতে না-পারলে যে আপনার সর্বস্ব যায়!'

'ট্রেন ধরতে পারবোই। ছাব্বিশে দুপুরের আগে কলকাতা থেকে হংকং-এর জাহাজ ছাড়বে না। আজ তো কেবল বাইশে। এখনো ঢের সময় আছে।'

এমন স্থির ও নিশ্চিন্ত উত্তরের আর কোনো জবাব দেয়া যায় না। অন্যান্য যাত্রীদের অনেকেই এ-কথা জানতো যে, খোলবিতেই গাড়ি বদল করতে হয়। প্রত্যেকেই নিজের-নিজের বন্দোবস্ত ক'রে রেখেছিলো। কারো জন্যে ঘোড়া, কারো জন্যে বা গোরুর গাড়ি'

অপেক্ষা করছিলো। যাত্রীরা নিজের-নিজের যানবাহন নিয়ে প্রস্থান করলো। ফিলিয়াস ফগ আর স্যর ফ্রান্সিস কোনোরকম যান-বাহনই পেলেন না। ফগ তখন বললেন: 'যখন কোনো যানের সুবিধে নেই, তখন আর উপায় কী? আমি হেঁটেই যাবো।'

এই কথা শুনে পাসপার্তু তার নতুন চপ্পলের দিকে তাকালো একবার।

অল্পক্ষণ পরে পাসপার্তু এসে খবর দিলে: 'আমাদের যাবার উপায় হয়েছে। একটা হাতি এখানে আছে।'

'চলো, দেখে আসা যাক।'

স্টেশনের কাছেই সেই হাতির মালিক থাকতো। পাসপার্তু ফগ আর স্যর ফ্রান্সিসকে নিয়ে সেখানে গেলো। সবলদেহ হাতি-টির দিকে তাকিয়ে ফগ বুঝলেন, হাতিটি তাঁদের এলাহাবাদ পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারবে। মালিককে জিজ্ঞেস করলেন: 'তোমার হাতির নাম কী?'

'কিউনি।'

'চলে কেমন হাতিটা?'

'বেশ দ্রুতই চলে।'

'ভাড়া যাবে?'

'আমার হাতি "গরম" হয়েছে। এ হাতি ভাড়া দেবো না।'

ফিলিয়াস ফগ নাছোড়বান্দা। বললেন: 'আমি ঘণ্টায় দেড়শো টাকা ভাড়া দেবো।'

'না, আমি ভাড়া চাই না।'

মুহূর্তমধ্যে ঘণ্টায় চারশো টাকা ভাড়া উঠলো, কিন্তু মালিক বললে: 'না সাহেব। আপনারা অন্যত্র চেষ্টা করুন।'

পাসপার্তুর মুখ বিবর্ণ হ'লো। স্যর ফ্রান্সিস বুঝলেন, পৃথিবী-ভ্রমণ এইখানেই খতম হ'লো।

ফিলিয়াস ফগ তখনো অবিচলিত। বললেন : 'ভাড়া না দাও, বিক্রি করো। আমি পনেরো হাজার টাকা দেবো।'

মালিক মাথা নাড়তে-নাড়তে ভাবলো, সাহেবটা পাগল নাকি?

ব্যাপার দেখে স্যর ফ্রান্সিস ফগকে আড়ালে ডেকে নিয়ে দাম বাড়াতে নিষেধ করলেন : 'অনেক দাম হয়েছে। এর চেয়ে ঢের কম দামে এ দেশে হাতি পাওয়া যায়।'

ধীর কণ্ঠে ফগ জবাব দিলেন : 'উত্তেজিত হ'য়ে আমি কখনো কিছু করি না। ঠিক সময়ে এলাহাবাদ তো যেতেই হবে, তার উপরেই তিন লাখ টাকার বাজি নির্ভর করছে। যে-ক'রেই হোক, হাতিটা চাই-ই চাই।' পরক্ষণেই মালিকের কাছে এসে বললেন : 'পনেরো হাজারে হবে না? আচ্ছা, আঠারো হাজার? বিশ হাজার? পঁচিশ হাজার? তাও না! আচ্ছা, তিরিশ হাজারই সই। তিরিশ হাজার দেবো।'

তিরিশ হাজার! পাসপার্তুতের মুখ পাণ্ডুর হ'য়ে গেলো। স্যর ফ্রান্সিস হতবুদ্ধি হ'য়ে গেলেন। হাতির মালিক দেখলো, আর বেশি আশা করা ভালো নয়—কী জানি, যদি সাহেবের মন ঘুরে যায়! সে হাতিটা বিক্রি করতে রাজি হ'লো।

তক্ষুনি একজন মাহুত জোগাড় ক'রে ফিলিয়াস ফগ পাসপার্তুত আর স্যার ফ্রান্সিসকে সঙ্গে নিয়ে এলাহাবাদের দিকে যাত্রা করলেন।

পার্শি মাহুতটির পথ-ঘাট ভালোই জানা ছিলো। বিশ মাইল পথ সংক্ষেপ করবার জন্য সে বনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'লো।

ফিলিয়াস ফগ আর স্যার ফ্রান্সিস দুজনে দুটি ছোটো হাওদায় বসলেন। পাসপার্তুত দুই হাওদার মাঝখানে আশ্রয় নিলো। ঘণ্টা-দুই চলবার পর যখন সকলে জিরিয়ে নেবার জন্য হাতির পিঠ থেকে নামলেন, তখন সকলেই খুব শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছেন—দুলতে-দুলতে সকলেরই সারা শরীর ব্যথায় জর্জর হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু ফগের সেদিকে খেয়ালও ছিলো না। স্যর ফ্রান্সিস অবাক হ'য়ে

বললেন : 'মিস্টার ফগ যেন লোহায় গড়া!' পাসপার্তুত যোগ করলো : 'কাঁচা লোহায় নয়, পাকা লোহায়।'

সামান্য কিছু আহার ক'রে মাহুতের নির্দেশমতো সকলে আবার হাতির পিঠে উঠলেন। মাহুতের ইঙ্গিতে বিশালদেহী কিউনি হেলে-দুলে বনভূমি পেরিয়ে তাল-খেজুরের বনের পাশ দিয়ে চলতে লাগলো। জায়গাটার নাম বুন্দেলখণ্ড। দেশীয় রাজাই ছিলেন বুন্দেলখণ্ডের সর্বময় কর্তা। একদল উন্মত্ত হিন্দু বাস করতো সেখানে। আরোহী-সমেত দ্রুতগামী হাতি দেখে কোথাও-কোথাও কতগুলো লোক কুটিল ক্রোধে এমন হাবভাব দেখালো যে বোঝা গেল সুযোগ পেলেই বিপদ ঘটাতে দ্বিধা করবে না। বলা বাহুল্য, এরাই বুন্দেল-খণ্ডের সুবিখ্যাত দস্যুদল।

পাসপার্তুত তখন ভাবছিলো, এলাহাবাদ পৌঁছে মিস্টার ফগ হাতিটার কী ব্যবস্থা করবেন? কিউনি কি তাঁর সঙ্গেই যাবে? উঁহু, সে তো সম্ভব নয়! ঢের খরচ পড়বে তবে। বোধহয় বিক্রি ক'রে দেবেন হাতিটা। কিন্তু কিনবে কে হঠাৎ? কিউনির যে-রকম পরিশ্রম হচ্ছে, তাতে মনে হয় ছেড়েই দেবেন এঁকে। আর যদি আমাকেই বখশিশ ক'রে বসেন তাহ'লেই হবে সবচেয়ে মুশকিলের ব্যাপার!

তখন প্রায় সন্ধে হ'য়ে এসেছে। বিন্ধ্য পর্বতের কতগুলো দুরারোহ উৎরাই পেরিয়ে হাতি একটা ভাঙাচোরা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। ফিলিয়াস ফগ হিশেব ক'রে দেখলেন, মাত্র অর্ধেক পথ এসেছেন। রাত তখন অন্ধকারে ছাওয়া। একটু ঠাণ্ডাও পড়েছিলো। পার্শি মাহুত যে আগুনের কুণ্ড জ্বাললো, তারই চারদিকে ব'সে সবাই খাওয়া-দাওয়া শেষ করলেন।

পাসপার্তুত ছাড়া সকলেরই বেশ ভালো ঘুম হয়েছিলো। সারাদিন হাতির পিঠে দুলে-দুলে পথ চলতে হয়েছিলো ব'লে সে রাত্রেও ঘুমের ঘোরে তাই করতে লাগলো—ভালো ক'রে ঘুমই

এলো না তার। স্যর ফ্রান্সিসের লড়াইয়ের অভিজ্ঞতা ছিলো। তাই স্থানে-অস্থানে ঘুমোনোর অভ্যেসও ছিলো। আর নির্বিকার-চিত্ত ফিলিয়াস ফগ নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোচ্ছেন—যেন তাঁর সেভিল রো'র বাসার বিছানায় শুয়েছেন।

সকাল ছ-টার সময় তাঁরা আবার হাতির পিঠে উঠে বসলেন। মাহুত জানালো যে, সন্ধের আগেই এলাহাবাদ পৌঁছোনো যাবে। সে লোকালয় ছেড়ে ছায়া-ঘেরা বনপথেরই আশ্রয় নিয়েছিলো। অনেকক্ষণ চলবার পর হঠাৎ হাতিটি থমকে দাঁড়ালো।

একি! এখন মাত্র বিকেল চারটে,—এখনি কিউনি থামলো কেন! স্যর ফ্রান্সিস মাহুতকে শুধোলেন: 'থামলে যে? কী হ'লো হঠাৎ?'

পার্শি মাহুতটি বললে: 'কী জানি, ঠিক বুঝতে পারছি না। কী যেন আসছে।'

সবাই কান পেতে শুনলেন, দূর থেকে একটা বাজনার শব্দ ক্রমশ এগিয়ে আসছে। ধীরে-ধীরে সে শব্দ স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হ'য়ে উঠলো। মাহুত কিউনিকে একটা গাছে বেঁধে রেখে কী ব্যাপার দেখবার জন্যে একটু এগিয়ে গেলো।

একটু বাদেই ফিরে এলো সে। দ্রুত কণ্ঠে বললে: ব্রাহ্মণদের একটা শোভাযাত্রা আসছে! চলুন, আমরা পালিয়ে যাই!'

হাতি নিয়ে বনের গভীরে ঢুকলো মাহুত।

ঢাক-ঢোলের আওয়াজ আর চ্যাঁচামেচি-ভরা একটা তুমুল কোলাহল ক্রমেই এগিয়ে আসতে লাগলো। দেখতে-দেখতে শোভাযাত্রা এলো দৃষ্টিপথে। উষ্ণীষ আর আলখাল্লা-পরা পুরোহিতরা চলেছেন শোভাযাত্রার আগে-আগে। নানাবয়সী লোকজন সমবেত স্বরে এক করুণ শ্মশান-সংগীত গাইতে-গাইতে পুরোহিত-দের ঘিরে চলেছে। ঢাক-ঢোলের আওয়াজের নিচে মাঝে-মাঝে সেই গানের শব্দ চাপা প'ড়ে যাচ্ছিলো।

এদের পিছনেই একটা রথ টেনে নিয়ে চলেছে ক-একটা ঘোড়া। রথের উপর এক দেবী মূর্তি। ভয়ঙ্কর তাঁর রূপ। মূর্তি দেখে স্যর ফ্রান্সিস চিনতে পারলেন। বললেন : 'এই-ই হিন্দুদের কালী মূর্তি। তাদের প্রেম আর মুক্তির প্রতিভূ।'

পাসপার্তুত ব'লে উঠলো : 'উঃ, কী ভীষণ রূপ এর! এ হ'লো মৃত্যুর প্রলয়ঙ্করী মূর্তি, প্রেমের স্নিগ্ধ আভার প্রতিমা নয়!' আরো বলতে যাচ্ছিলো সে, কিন্তু মাহুতের ইঙ্গিতে তাকে চুপ করতে হ'লো।

কালী মূর্তিটিকে ঘিরে জন-কতোক পুরোহিত উন্মাদের মতো নাচছিলো। এদের পরই দেখা গেলো দামি-পোশাক-পরা একদল ব্রাহ্মণকে। এরা এক ভদ্রমহিলাকে সবলে টেনে আনছিলো। ভদ্রমহিলা প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে-সঙ্গে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছিলেন।

ভদ্রমহিলা অপূর্ব সুন্দরী। য়ুরোপীয়দের মতো উজ্জ্বল গৌর গায়ের রং। সারা গায়ে বহুমূল্য অলংকার। পরনে সোনা-খচিত মখমলের পোশাক, তার উপর মসলিনের একটা ওড়না। তার ভিতর দিয়ে তাঁর সুকুমার দেহ-লাবণ্য ও অতুলন দেহগঠন ফুটে বেরোচ্ছিলো।

মহিলাটির চারধারে খোলা তলোয়ার হাতে বন্দুক কাঁধে একদল প্রহরী। এদের পিছনে একদল লোক একটি শবাধার ব'য়ে আনছিলো। শবটি একজন বৃদ্ধের। বহুমূল্য রাজপোশাকে ঢাকা। মুক্তো-খচিত উষ্ণীষ, সোনা আর রেশমের তৈরি দেহাবরণ, কটিবন্ধ কিংখাপের উপর হীরক বসানো। মৃতদেহের পাশে বহুমূল্য অস্ত্র-শস্ত্র প'ড়ে। সব-পিছনে কতগুলো লোক উন্মাদের মতো বিকট চীৎকার করতে-করতে এগোচ্ছিলো। তাদের চীৎকারের নিচে গান-বাজনার আওয়াজ চাপা প'ড়ে গিয়েছিলো।

স্যর ফ্রান্সিস মাহুতের দিকে তাকিয়ে শুধোলেন: 'এই বুঝি সতী?'
মাহুত ঠোঁটে আঙুল দিয়ে সকলকে নীরব থাকতে ইঙ্গিত করলো।

শোভাযাত্রা কিছুক্ষণ বাদে অরণ্যের গভীরে অদৃশ্য হ'য়ে গেলে পর ফিলিয়াস ফগ শুধোলেন : 'সতী কী ?'

স্যর ফ্রান্সিস জবাব দিলেন : 'এ এক ধরনের নরবলি। তবে তফাৎ এই যে, যে নিহত হয়, সে স্বেচ্ছায় প্রাণ দেয়। এখুনি যে ভদ্রমহিলাকে দেখলেন, কাল ভোরে তাঁর দেহ আগুনে পুড়বে।'

পাসপার্তু উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো : 'কী সর্বনাশ! এরা কি রাক্ষস নাকি ?'

ফিলিয়াস ফগ প্রশ্ন করলেন : 'ঐ মৃতদেহটি কার ?'

মাহুত বললে : 'ঐ ভদ্রমহিলার বৃদ্ধ স্বামীর। তিনি এ-অঞ্চলের একজন স্বাধীন রাজা ছিলেন।'

'এখনও এই সর্বনেশে প্রথা চালু আছে ?'

'ভারতের বেশিরভাগ জায়গায়ই এ-প্রথা এখন আর চলতি নেই,' স্যর ফ্রান্সিস বললেন : 'তবে বুন্দেলখণ্ডে এখনো এই প্রথা প্রচলিত—স্বাধীন রাজ্য কি-না, তাই ইংরেজের আইন চালু হয় নি। এভাবে জীবন্ত পুড়ে মরতে রাজি না-হ'লে তার কপালে আজীবন যে কতো দুঃখ আছে, তার ইয়ত্তা নেই। সমাজ তার মাথা মুড়িয়ে দেবে, একঘরে করবে, তার ছায়া পর্যন্ত মাড়াবে না। কিছুদিন আগে আমি যখন বোম্বাই ছিলুম, তখন একবার একটি বিধবা তার স্বামীর সঙ্গে সহমরণে যাওয়ার জন্যে গবর্নরের অনুমতি চেয়েছিলো। গবর্নর সে-অনুমতি না-দেয়ায় বিধবাটি খুব ক্ষুব্ধ হ'য়ে বোম্বাই ছেড়ে চ'লে গেলো অন্যখানে। সেখানে একজন রাজার সাহায্যে শেষে আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মরলো।'

মাহুত ঘাড় নেড়ে এ-কথা স্বীকার ক'রে বললে : 'কাল যে সতীদাহ হবে, তা কিন্তু স্বেচ্ছায় হবে না।'

'তুমি কী ক'রে জানলে ?' ফিলিয়াস ফগ শুধোলেন।

'বুন্দেলখণ্ডে এ-কথা কে না জানে ?'

'কিন্তু কই, ভদ্রমহিলাকে তো কোন বাধা দিতে দেখলুম না ?'

'কী ক'রে বাধা দেবেন? আফিং আর ধোঁয়ায় তাঁর কি আর এখন জ্ঞান আছে!'

'ওকে ওরা কোথায় নিয়ে যাচ্ছে?'

'পিল্লাজির মন্দিরে। এখান থেকে সে-মন্দির দু-মাইল দূরে। আজ রাত্রে সবাই এখানে থাকবে। কাল খুব ভোরে সতী হবে।' এই ব'লে মাহুত যেই হাতিটি চালাতে যাবে, অমনি ফিলিয়াস ফগ বাধা দিলেন: 'রাখো, রাখো। স্যর ফ্রান্সিস, আমরা যদি ভদ্র-মহিলাকে রক্ষা করি?'

'রক্ষা করবেন!' স্যর ফ্রান্সিস অবাক হলেন।

'এখনো আমার হাতে বারো ঘণ্টা সময় আছে।' ফিলিয়াস ফগ বললেন: 'ততোক্ষণ পর্যন্ত আমরা চেষ্টা ক'রে দেখতে পারি।'

উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলেন স্যর ফ্রান্সিস: 'এতোক্ষণে বুঝলুম, আপনার হৃদয় আছে! আর সে-হৃদয় সাড়া দেয় আসল জায়গায়!'

ফগ বললেন: 'কখনো-কখনো সাড়া দেয় বৈকি।'

চার ॥ দুঃসাহসের ডাকে ॥

ব্যাপারটি যেমন গুরুতর, তেমনি দুঃসাহসিক। অসম্ভব বললেও চলে। দুঃসাহসের ডাকে এভাবে সাড়া না-দিলেই ভালো করতেন ফগ। এ-কাজে রত হ'লে, কে জানে বিপক্ষের হাতে মরতে হবে কি-না তাঁকে! অন্তত চিরকালের জন্যে বন্দী হবেন কি না, তা কে জানে? তাহ'লেই তো সব খতম হ'য়ে গেলো। যে-জন্যে এতো পরিশ্রম ক'রে তিনি এতোদূর এসেছেন; তা হবে ব্যর্থ। আশি দিনে সারা পৃথিবী ঘুরে আসবার জন্যে যে-বাজি ধরেছেন, তাহ'লে সেই বাজিতে হারতে হবে তাঁকে। কিন্তু তাঁর হৃদয় মানলো না কোনো বাধাই। তিনি দেখলেন, এ-কাজে স্যর ফ্রান্সিস একজন শক্তিশালী সহযোগী। পাসপার্তুতও যথাসাধ্য চেষ্টা করবে। এক ভাবনা

মাহুতের জন্যে। সে যদি সাহায্য না-করে, না করলো—কিন্তু দেখতে হবে সে যাতে বিপক্ষের দলে না যায়।

স্যর ফ্রান্সিস তাই সোজাসুজি মাহুতকে সে-কথা জিজ্ঞেস করলেন। মাহুত জবাব দিলে, 'আমি পার্শি। আপনারা যাঁকে উদ্ধার করতে চাইছেন, তিনিও পার্শি। আপনারা যা বলবেন, আমি তাই করবো।' সে আরো বললে: 'আপনারা মনে রাখবেন, আমাদের সামনে মস্ত একটা বিপদ পাহাড়ের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। এ-কাজে শুধু যে আমাদের জীবনের আশঙ্কা আছে, তাই নয়—যদি আমরা ধরা পড়ি, যন্ত্রণারও কমতি হবে না।'

ফিলিয়াস ফগ জবাব দিলেন: 'সে-সব বিপদ ঘাড়ে নিতে আমরা তৈরি আছি। সন্ধে অবধি অপেক্ষা করা যাক, রাতের অন্ধকারে কাজ শুরু করা যাবে। ভদ্রমহিলাটি কে, তুমি জানো?'

মাহুত বললে, 'ভদ্রমহিলার নাম আউদা। বোম্বাইয়ের একজন ধনী বণিকের মেয়ে। তিনি রীতিমতো বিলিতি শিক্ষা পেয়েছেন। মা বাবা কেউ নেই ওঁর। নিজের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই বুড়ো রাজার সঙ্গে আজ তিন মাস হ'লো ওঁর বিয়ে হয়েছে। ভয়ানক দুরদৃষ্টের কথা ভেবে তিনি পালিয়ে যাবারও চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হন নি। রাজার ক-একজন আত্মীয় আছেন। আউদা বেঁচে থাকলে তাঁদের সুবিধে হবে না ব'লে তাঁরা জোর ক'রে তাঁকে পুড়িয়ে মারছেন।'

মাহুতের কথা শুনে ফিলিয়াস ফগের সংকল্প আরো দৃঢ় হ'লো। মাহুতকে বললেন: 'কোনো সাড়াশব্দ না-ক'রে পিল্লাজির মন্দিরের যতো কাছে পারো ততো কাছে নিয়ে চলো।'

কিউনি আধঘণ্টার মধ্যে তাঁদের নিয়ে মন্দিরের প্রায় আধ মাইল দূরে এসে দাঁড়ালো। গাছপালার আড়াল থেকে তখন সেই তুমুল শোরগোল শোনা যেতে লাগলো।

মাহুত বললে: 'রানী আউদা নিশ্চয়ই এখন মন্দিরের মধ্যে বন্দিনী।'

সকলেই ভাবতে লাগলেন, কী ক'রে তাঁকে উদ্ধার করা যায়। রাত্রে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়বে, তখন কি মন্দিরে প্রবেশ করা ঠিক হবে, না দেয়াল ভেঙে সেই ফাঁক দিয়ে ভিতরে ঢুকলে সুবিধে হবে? মন্দিরের কাছে না-গেলে এ-প্রশ্নের জবাব পাওয়া যাবে না।

তাঁরা উদগ্রীব হ'য়ে রাত্রির প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। সন্ধে ছ-টার সময় অন্ধকারে ঢাকা পড়লো বন। প্রহরীদের অতিক্রম ক'রে মন্দিরের কাছে যাওয়ার সেই একমাত্র সুসময় দেখে মাহুত তাঁদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। তাঁরা ধীরে-ধীরে খুব সাবধানে বনপথে হামাগুড়ি দিয়ে এগোলেন। একটু যাওয়ার পরই ছোট্ট একটা ঝর্নার কাছে এসে পৌঁছুলেন তাঁরা। মশালের আলোয় দেখলেন, রাশি-রাশি চন্দনকাঠ দিয়ে একটা চিতা তৈরি হয়েছে। সেই চিতায় শোয়ানো হয়েছে বুড়ো রাজার মৃতদেহ। রানী আউদার সঙ্গে পরদিন ভোরবেলাতেই তা ভস্মসাৎ হবে। চিতা থেকে মন্দিরটি একশো হাতের বেশি দূর হবে না। মন্দিরের গম্বুজটা সন্ধের অন্ধকারে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছিলো।

মাহুতের ইঙ্গিত-মতো বড়ো-বড়ো ঘাসের আড়ালে লুকিয়ে-লুকিয়ে তাঁরা আরও সাবধানে রুদ্ধ নিশ্বাসে নিঃশব্দে এগোতে লাগলেন।

খোলা মাঠের কাছে এসে মাহুত থামলো। সিদ্ধি খেয়ে বিভোর হ'য়ে প্রহরীরা সেখানে শুয়ে ছিলো। দু-একজন তখনো টলতে-টলতে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিলো। কাছেই গোটা-কয়েক মশাল জ্বলছিলো কম্পিত শিখায়। মশালের আলোয় তাঁরা অবাক হ'য়ে তাকিয়ে দেখলেন, সবলদেহ রাজপুত প্রহরীরা খোলা তলোয়ার হাতে মন্দিরের সামনে পায়চারি ক'রে পাহারা দিচ্ছে।

আর এগোলো না মাহুত। বুঝলো, বিনা বাধায় এ-পথে এগোনো অসম্ভব। স্যর ফ্রান্সিস আর ফগেরও সেই ধারণা হ'লো। তাঁরা মৃদুস্বরে পরামর্শ করতে লাগলেন। স্যর ফ্রান্সিস বললেন:

'আরো খানিকক্ষণ অপেক্ষা করা যাক। এই তো সবে আটটা বাজলো। বেশি রাতে প্রহরীরা ঘুমিয়ে পড়তে পারে।'

তাঁরা তখন একটা গাছের নিচে শুয়ে উত্তেজিত মনে সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলেন। সময় যেন আর যেতে চায় না। মাহুত মধ্যে-মধ্যে এদিক-ওদিক গিয়ে খবর নিতে লাগলো। দেখলো, প্রহরীরা আগের মতোই পাহারা দিচ্ছে। মশালও আগের মতোই জ্বলছে। মন্দিরের ভিতর থেকেও তখন জানলা দিয়ে কম্পিত আলোকরেখা দেখা যাচ্ছিলো।

রাত গভীর হ'লো, কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন ঘটলো না বিন্দুতিল। তখনো অতন্দ্র চোখে পাহারা দিচ্ছিলো প্রহরীরা। মনে হ'লো, তারা যেন সারা রাতই এ-ভাবে জেগে কাটিয়ে দেবে। এ-পথ ছেড়ে মন্দিরের দেয়াল ভেঙে ভিতরে ঢুকবার চেষ্টাই তখন যুক্তিযুক্ত ব'লে মনে হ'লো। তাই মাহুত ফের অগ্রসর হ'লো। ফগ, পাসপার্তু আর স্যর ফ্রান্সিস মাহুতকে অনুসরণ করলেন।

অন্ধকার ঘন ছিলো ব'লে দেখা যাচ্ছিলো না কিছু। দূরের মশালগুলো যেন চারপাশের অন্ধকারকে আরো গাঢ় ক'রে তুলেছিলো। তাঁরা ভাবলেন, আর-কিছু চাই না, কোনো রকমে মন্দিরের দেয়ালের সন্ধান পেলেই হ'লো। প্রবেশের পথ থাকলো তো ভালোই,—না থাকলে পথ বের ক'রে নিতে হবে।

একটু বাদেই মন্দিরের ইটের দেয়াল গায়ে ঠেকলো। সেদিকে কোনো দরজা বা জানলা ছিলো না। ফগ আর স্যর ফ্রান্সিস অন্য-কোনো সরঞ্জাম না-থাকায় পকেট-ছুরির সাহায্যে ইট খুলতে লাগলেন। মাহুত আর পাসপার্তু সেই আলগা ইটগুলো ধীরে-ধীরে খুলে নিতে লাগলো।

খান-কয়েক ইট খুলবার সঙ্গে-সঙ্গেই মন্দিরের ভিতর হঠাৎ কে যেন চেঁচিয়ে উঠলো। বাইরে সঙ্গে-সঙ্গে কোলাহল উঠলো। পাসপার্তু আর মাহুত থামলো। সেখানে আর অপেক্ষা করা ঠিক হবে

না মনে ক'রে স্যর ফ্রান্সিস সকলকে নিয়ে দূরে স'রে গেলেন। ভাবলেন পরে সুযোগ পেলে আবার আসবেন। কিন্তু সে-সুযোগ আর হ'লো না। প্রহরীরা তক্ষুনি মন্দিরটি ঘিরে দাঁড়ালো।

রাগে স্যর ফ্রান্সিস ফুলতে লাগলেন। পাসপার্তু খুব উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো। অনেক চেষ্টায় আত্মসংবরণ করলো মাহুত। শুধু ফিলিয়াস ফগ তখনো অবিচলিত রইলেন।

স্যর ফ্রান্সিস বললেন: 'আর কেন? চলুন, এবার ফিরে যাওয়া যাক।'

ধীর কণ্ঠে ফগ জবাব দিলেন: 'অতো তাড়া কিসের? আমি যদি কাল দুপুরবেলা এলাহাবাদ পৌঁছুতে পারি, তাহ'লেই হবে। দেখা যাক না শেষ পর্যন্ত। শেষ মুহূর্তেও তো আমাদের কোনো একটা সুযোগ ঘটতে পারে।'

স্যর ফ্রান্সিস ফগের এই অবিচলিত ধৈর্য দেখে বিস্মিত হলেন। ভাবলেন, শেষ মুহূর্তে ওঁর আর কী সুযোগ ঘটবে? উনি কি তবে জ্বলন্ত চিতায় লাফিয়ে প'ড়ে রানী আউদাকে উদ্ধার করবেন? এ-রকম প্রয়াস যে বিফল ও বিপজ্জনক হবে, সে তো সকলেই জানে। ফিলিয়াস ফগের মতো ধীর স্থির স্থিতধী ইংরেজ যে অবোধের মতো এমন একটা কাজ করবেন, এ কথা স্যর ফ্রান্সিসের মোটেই বিশ্বাস হ'লো না। তবু এই ভয়ানক দৃশ্যের যবনিকাপাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি হলেন তিনি। মাহুত আবার পথ দেখিয়ে তাঁদের বনের বাইরে মাঠের কিনারে নিয়ে গেলো। তাঁরা সেখানে লুকিয়ে থেকে সেই নৃশংস হত্যার আয়োজন দেখতে লাগলেন।

পাসপার্তু মনে মনে একটা মৎলব ক'রে নিয়েছিলো। সকলের অলক্ষ্যে ও যে কোথায় চ'লে গেলো, তা কেউ জানতেও পারলেন না। অন্ধকারে পাসপার্তু গাছের তলা দিয়ে খুব সাবধানে সেই চিতা-শয্যার দিকে এগোতে লাগলো। কোথায় যাচ্ছে ও, কে জানে!

আস্তে আস্তে ভোর হ'য়ে এলো। প্রসন্ন প্রভাতের সোনালি

আকাশের কোলে ক্ষীণ হাসির মতো ফুটে উঠলো ; কিন্তু, মন্দিরের চারদিকে তখনো ঘন অন্ধকার ছিলো। এই আলো-অন্ধকারের সন্ধিক্ষণই সতীদাহের সময় বলে ঠিক করা হয়েছিলো। আস্তে আস্তে ঘুম থেকে উঠলো সবাই। তাদের চেঁচামেচিতে আর ঢাক ঢোলের তীব্র আওয়াজে কেঁপে উঠলো বন প্রান্তর। ক্রমশ সতীদাহের সময় এসে উপস্থিত হ'লো।

হঠাৎ খুলে গেলো মন্দিরের দরজা। খোলা দরজা দিয়ে মন্দিরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো সুতীব্র আলোর ঝলক। দেখা গেলো, দুজন পুরোহিত দুদিক থেকে ধ'রে সেই মৃত্যুপথ-যাত্রীকে মন্দিরের বাইরে আনলো টেনে। বার-কয় পালানোর চেষ্টা ক'রে আফিঙের ধোঁয়ায় আবার নেতিয়ে পড়লেন ভদ্রমহিলা। পুরোহিতেরা রানী আউদাকে নিয়ে চিতার দিকে এগোলো। প্রভাতের অর্ধস্ফুট আলোয় সেই ভয়ানক দৃশ্য অপলক চোখে দেখতে লাগলেন ফিলিয়াস ফগ।

চিতার উপর বুড়ো রাজার মৃতদেহ প'ড়ে। রানী আউদাকে: তাঁর মৃত স্বামীর পাশে শুইয়ে রাখা হ'লো। স্তূপীকৃত চন্দন কাঠে আগুন লাগিয়ে দেয়া হ'লো—অমনি ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায় ভরে উঠলো চারদিক। তুমুল শব্দে বেজে উঠলো বাজনা।

ছুরি হাতে ফগ সেই অগ্নিকুণ্ডের দিকে এগোবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু স্যর ফ্রান্সিস আর মাহুত অনেক কষ্টে তাঁকে ধ'রে আটকালেন। ফিলিয়াস ফগ ওঁদের ধাক্কা দিয়ে ফের খালি-পা বাড়ালেন, অমনি এক অভাব্য অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে হতচকিত হয়ে পড়লেন ; দাঁড়িয়ে রইলেন পাথরের মতো।

সতীদাহ করতে যারা এসেছিলো ভীতস্বরে তারা উঠলো চেঁচিয়ে। আশঙ্কায় উদ্বেগে বিস্ময়ে বিস্ফারিত চোখে তারা তাকিয়ে দেখলো, বৃদ্ধ রাজা নবজীবন লাভ করেছেন। রানী আউদাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে সেই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন

রাজা। তারা ভয়ে তাদের পুনরুজ্জীবিত রাজার দিকে আর তাকাতে পারলো না, প্রণত হয়ে মাটিতে মাথা ছোঁয়ালো।

চক্ষের পলকে জ্বলন্ত চিতা ছেড়ে রাজার প্রেতাত্মা ফিলিয়াস ফগের কাছে এসে বললো: 'আর দেরি নয়; চলুন, চলুন শিগগির!'

সবিস্ময়ে সবাই তাকিয়ে দেখলেন, অচৈতন্য আউদাকে কাঁধে পাসপার্তু দাঁড়িয়ে। ধোঁয়ায় যখন চারদিক ভরে গিয়েছিলো তখন সেই ধোঁয়ার মধ্যে স্তূপাকার কাঠের উপর উঠে সে রক্ষা করেছে মৃত্যুপথ-যাত্রীকে।

আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করলেন না তাঁরা। তক্ষুনি ছুটতে-ছুটতে প্রবেশ করলেন বনের গহনে। দ্রুতগামী কিউনি তাঁদের নিয়ে এলাহাবাদের দিকে ছুটলো।

নিস্তব্ধ অরণ্য খানিকক্ষণের মধ্যেই কোলাহল-চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। বন্দুকের আওয়াজে কেঁপে উঠলো চারদিক। হাতির পাশ দিয়ে শোঁ-শোঁ ক'রে গুলি ছুটে যেতে লাগলো। সতীদাহ করতে যারা এসেছিলো, তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে পাগলের মতো পিছু-পিছু ছুটে এলো বটে, কিন্তু বনের সেই গভীর গহনে হাতি কিংবা তার সোয়ারদের আর ধরতে পারলো না।

এই দুঃসাহসিক প্রয়াস সফল হ'য়ে যাওয়ায় হাতির পিঠে ব'সে হাসছিলো পাসপার্তু। স্যর ফ্রান্সিস তো খুশি হয়ে তার সঙ্গে বার-কয় হ্যাণ্ডশেক ক'রে ফেললেন, আর ফিলিয়াস ফগ শুধু বললেন: 'বেশ করেছো।' তাঁর মতো গম্ভীর-মেজাজ লোকের কাছ থেকে এই ছোট্টো প্রশংসাই যথেষ্ট। পাসপার্তু তাঁর প্রশংসার জবাবে বললো: 'এ-কাজের যা-কিছু গৌরব, যা-কিছু প্রশংসা সবই তো আপনার—আমি শুধু উপলক্ষ মাত্র।'

মৃত্যুর কবল থেকে রেহাই পেলেও আউদার জ্ঞান তখনো ফেরেনি। তাঁর দিকে তাকিয়ে স্যর ফ্রান্সিস বললেন: 'এঁর বিপদের এখানেই শেষ নয়। যদ্দিন ইনি ভারতবর্ষে থাকবেন, তদ্দিন এঁর

জীবন নিরাপদ নয়। ভারতবর্ষের যেখানেই থাকুন না কেন, এঁর ক্রুদ্ধ শত্রুরা এঁর সন্ধান করবেই, আর সুযোগ পেলেই পুড়িয়ে মারতে ছাড়বে না। ইংরেজের আইন, ইংরেজের পুলিস্ কিছুতেই এঁকে রক্ষা করতে পারবে না। দিন-কয়েক আগেই এমনি একটা ঘটনা হ'য়ে গেছে। ইনি যদি ভারতবর্ষের বাইরে যেতে পারেন, তবেই নিশ্চিন্ত হ'তে পারবেন।'

ফগ বললেন: 'এ-কথার জবাব এতো চটপট দেয়া যাবে না, ভেবে দেখতে হবে।'

বেলা দশটার সময় তাঁরা এলাহাবাদে এসে পৌঁছলেন। আউদার তখন ক্রমশ জ্ঞান ফিরে আসছিলো,—ধীরে ধীরে চোখ খুললেন। তাঁকে ওয়েটিং রুমে রেখে ফগ তাঁর জন্যে কতগুলো দরকারি জিনিশপত্র কিনতে পাসপার্তুতকে বাজারে পাঠালেন।

এলাহাবাদ থেকে ট্রেন ছাড়বার সময় হ'লো। ফিলিয়াস ফগ পার্শি মাহুতকে তার পাওনা-গণ্ডা চুকিয়ে দিয়ে বললেন: 'তুমি আমাদের জন্য যথেষ্ট করেছো। সেজন্য হাতিটা দিতে চাই তোমায়। নেবে তো?' মাহুতের চোখদুটো উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। ট্রেনে উঠতে-উঠতে ফগ বললেন: 'হাতিটা নিয়ে যাও। কিন্তু এতেও আমি তোমার ঋণ শোধ করতে পারলুম না।'

ট্রেন ছেড়ে দিলো। আউদার তখন পুরোপুরি জ্ঞান ফিরে এসেছিলো। সব শুনে কেঁদে ফেললেন তিনি। আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানালেন সবাইকে। কিন্তু পরমুহূর্তে ভবিষ্যতের চিন্তা ব্যাকুল ক'রে তুললো তাঁকে।

তাঁর মনোভাব বুঝতে পেরে ফগ বললেন: 'আপনার ভয় নেই। আমি হংকং যাচ্ছি। বাধা না থাকলে আপনাকেও সেখানে নিয়ে যেতে পারি।'

কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আউদা বললেন: 'হংকংএ আমার এক ধনী আত্মীয় ব্যবসা করতেন। বোধহয় তিনি সেখানেই আছেন।'

‘তাহ’লে তো খুব ভাল হ’লো।’ ফগ বললেন। ‘আমরা তাঁকে খুঁজে বার করবো।’

ছয় ॥ বিপদ যখন ঘনিয়ে আসে ॥

পঁচিশে অক্টোবর ভোরবেলা ফিলিয়াস ফগ কলকাতা পৌঁছলেন। বেলা একটার সময় হংকং-এর জাহাজ ছাড়বে, সুতরাং তখনো ঘণ্টা-কয়েক সময় হাতে ছিলো। ডায়েরি খুলে ফগ দেখলেন ছাব্বিশে অক্টোবর তাঁর কলকাতা পৌঁছবার কথা। আজ তেইশ দিন হ’লো লণ্ডন ছেড়েছেন তিনি। জাহাজ তাড়াতাড়ি আসায় হাতে যে-দু’দিন সময় পাওয়া গিয়েছিলো, আউদাকে উদ্ধার করতে গিয়েই তা কেটে গেছে। সময়ের হিশেব ক’রে ফগ বুঝলেন যে, যে-ক’রেই হোক একটার জাহাজেই তাঁকে হংকং যাত্রা করতে হবে।

হাওড়া স্টেশনে ট্রেন থামতে-না-থামতেই পাসপার্তু গাড়ি থেকে নেমে পড়লো। তার ইচ্ছে ছিলো আগেভাগেই হংকং-এর জাহাজে গিয়ে সব বন্দোবস্ত ক’রে রাখবার।

এমন সময় একজন ইংরেজ দারোগা এসে শুধোলেন: ‘আপনার নামই কি ফিলিয়াস ফগ?’

ঘাড় নেড়ে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দারোগার দিকে তাকাতেই দারোগা ফগকে জিগেস করলেন: ‘এ বুঝি আপনার ফরাশি ভৃত্য?’

‘হ্যাঁ।’

‘আপনারা কি অনুগ্রহ ক’রে আমার সঙ্গে আসবেন?’

ফিলিয়াস ফগ একটুও বিচলিত হ’লেন না। ইংরেজের চোখে আইন পবিত্র জিনিশ, আর পুলিশ দেশের আইন-রক্ষক। কিন্তু পাসপার্তু তর্ক করতে উদ্যত হ’লো। ফিলিয়াস ফগ তাকে থামিয়ে শুধোলেন: ‘এই ভদ্রমহিলা কি আমাদের সঙ্গে আসতে পারেন?’

‘অনায়াসে।’ জবাব দিলেন দারোগা।

তাঁরা তখন একটা ঘোড়ার গাড়িতে উঠে বসলেন। সাহেব-পাড়ার একটা বাড়ির সামনে এসে গাড়ি থামলো। দারোগা তাঁর বন্দীদের নিয়ে একটা ঘরে ঢুকলেন। সেখানে তাঁদের বসতে ব'লে জানালেন, 'ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াদিয়ার কাছে সাড়ে এগারোটার সময় আপনাদের বিচার হবে।' এই ব'লে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দারোগা প্রস্থান করলেন।

আউদার চোখে জল এসে গেলো: 'আমার জন্যেই আপনাদের এই বিপদ। আমাকে রক্ষা করতে গিয়েই আপনারা বন্দী হলেন।'

ফিলিয়াস ফগ শান্ত গলায় তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন: 'ইংরেজ রাজত্বে সতীদাহ নিবারণ করলে কোনো অপরাধ হয় না। বোধহয় পুলিশ ভুল ক'রে একজনকে ধরতে আমাদেরই ধরেছে। সে যাই হোক, নিশ্চিন্ত থাকুন আপনি। যে-ক'রেই হোক আপনাকে হংকংএ নিয়ে যাবোই।'

ফগের কথা শুনে পাসপার্তুত বললে: 'জাহাজ যে বেলা একটার সময় ছাড়বে!'

'তার আগেই আমরা জাহাজে যাবো।'

ফগের দৃঢ় কণ্ঠস্বর কিন্তু পাসপার্তুতের আশঙ্কা দূর করতে পারলো না।

সাড়ে এগারোটার সময় দারোগা এসে তাঁদের বিচার-স্থানে নিয়ে গেলেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ওয়াদিয়া এসে চেয়ারে বসতেই আরদালি হাঁকলো: 'আসামী ফিলিয়াস ফগ হাজির?'

'হাজির।'

'পাসপার্তুত?'

'হ্যাঁ, হাজির।'

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তখন বললেন: 'বাদীদের ডাকো।'

সঙ্গে-সঙ্গে একজন আরদালি তিনজন পুরোহিতকে সামনে এনে হাজির করলো। এঁরা তিনজনেই বোম্বাইয়ের লোক।

পাসপার্তু বিড়বিড় ক'রে আপন মনে বললে : 'এ দেখছি শেষে তাই ! এরাই তো আউদাকে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলো !'

অপরাধের বিবরণ প'ড়ে শোনানো হ'লো আসামীদের। হিন্দুদের পবিত্র একটি মন্দিরকে অপবিত্র করবার জন্যে ফিলিয়াস ফগ ও তাঁর ভৃত্যের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হয়েছে।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ফিলিয়াস ফগের দিকে তাকালেন 'অভিযোগ সম্পর্কে আসামীর কী বলবার আছে ?'

নিজের পকেট-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ফগ বললেন : 'হ্যাঁ, আমি অপরাধ স্বীকার করছি।'

'আপনি অপরাধ স্বীকার করছেন ?'

'হ্যাঁ। পিল্লাজির মন্দিরে পুরোহিতেরা যে-কাণ্ড করেছেন, সে-সম্পর্কে তাঁরা কী বলতে চান, আমি সে কথা জানবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছি।'

পুরোহিতেরা মুখ-চাওয়া-চাউয়ি করলেন। ফগ কোন কথার উল্লেখ করছেন, তা তাঁরা বুঝতে পারলেন না।

পাসপার্তু বললে : 'হ্যাঁ, ঠিক তাই। পিল্লাজির মন্দিরের কথাই জানতে চাই। সেখানে এঁরা একজন নির্দোষ মহিলাকে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারবার চেষ্টা করছিলেন।'

কথা শুনে তো পুরোহিতেরা একেবারে থ' ! কোনো কথাই বলতে পারলেন না তাঁরা এত হতভম্ব হ'য়ে পড়েছিলেন। ওয়াদিয়া অবাক হ'য়ে শুধোলেন : 'তার মানে ? কাকে পুড়িয়ে মারবার আয়োজন হয়েছিলো ? সে কোথায় ? বোম্বাই-এ নাকি ?'

পাসপার্তু বললো : 'হ্যাঁ, বোম্বাই-এ।'

'আমরা পিল্লাজির মন্দিরের কথা বলছি নে, মালাবারের মন্দিরের কথা বলছি।' পেশকার জানালো। 'অপরাধের প্রমাণ হিশেবে, সেই মন্দির-অপবিত্রকারীর জুতো এখানে আনা হয়েছে।'

জুতো দেখেই পাসপার্তু ব'লে উঠলো : 'একী! ও যে আমার জুতো!'

এখানে আগেকার কথা কিছু ব'লে নেয়া দরকার। বোম্বাইয়ের রেল স্টেশনে ফিক্স যখন দেখলেন ব্যাংক-দস্যু পালিয়ে যাচ্ছে, তখন মালাবারের পুরোহিতদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তাঁদের প্রচুর পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে মন্দির অপবিত্র করবার জন্যে মোকদ্দমা করতে স্বীকার করালেন। পুরোহিতদের মধ্যে কেউ-কেউ পরের ট্রেনেই ফগকে অনুসরণ করলো।

কলকাতায় এসে ফিক্স দেখলেন, ফগ তখনো কলকাতায় পোঁছোন নি। তখনি তিনি বুঝলেন, ব্যাংক-দস্যু ফাঁকি দেয়ার জন্যে পথে কোথাও নেমেছে, দু-একদিনের মধ্যেই নিশ্চয় এসে পড়বে। ফিক্স হাওড়া স্টেশনেই অপেক্ষা করতে লাগলেন। পঁচিশে অক্টোবর ভোরবেলা পাসপার্তু ট্রেন থেকে নামলো, অমনি তাঁর ইঙ্গিতে কলকাতার দারোগা তাঁদের গ্রেপ্তার করলেন। পাসপার্তু যদি মুহূর্তের জন্যেও আদালতের চারদিকে তাকিয়ে দেখতো, তবে দেখতে পেতো, সেই ঘরের এক কোণে ব'সে ফিক্স বিপুল আগ্রহে এই মামলার শুনানি লক্ষ করছেন। তখনো ব্যাংক-দস্যুকে গ্রেপ্তার করবার আশা ফিক্স ছাড়েন নি। বিলেতের ওয়ারেণ্ট কলকাতায় পাবার আশা তখনো তাঁর ছিলো।

ওয়াদিয়ার প্রশ্নের জবাবে অপরাধ স্বীকার করলে ম্যাজিস্ট্রেট রায় দিলেন : 'ইংরেজ গভর্মেণ্ট ভারতবর্ষের সকল ধর্মই রক্ষা করতে কসুর করেন না। পাসপার্তু গত বিশে অক্টোবর বোম্বাইয়ের অন্তর্গত মালাবারের মন্দিরে প্রবেশ ক'রে মন্দির অপবিত্র করেছে। সে এই অপরাধ স্বীকারও করছে। বিচার পনেরো দিনের জন্যে মুলতুবি রইলো। ততোদিন হাজত।'

পাসপার্তু বিহ্বল হ'য়ে চেঁচিয়ে উঠলো : 'পনেরো দিন হাজত বাস!' আরদালি চীৎকার ক'রে বললে : 'চুপ, চুপ!' ম্যাজিস্ট্রেট

রয়ে পাঠ করতে লাগলেন: 'যদিও দেখা যাচ্ছে ফিলিয়াস ফগ মন্দির অপবিত্র করার কাজে জড়িয়ে ছিলেন না, তবু পাসপার্তুর্তের পলায়নে সাহায্য করার জন্যে তাঁর প্রতিও ঐ আদেশ হ'লো।'

শুনে আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠলেন ফিক্স। ফিলিয়াস ফগ তো দু-হপ্তার জন্যে কলকাতায় আটকা পড়লেন, এর মধ্যে নিশ্চয়ই বিলেত থেকে ওয়ারেন্ট এসে পৌঁছুবে। আর পাসপার্তুর্তের তখন নিজের উপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিলো। তারই নির্বুদ্ধিতায় ফগের সর্বনাশ হ'তে চললো দেখে নিজের গালে চড় কষাবার ইচ্ছে হচ্ছিলো তার।

কিন্তু ফিলিয়াস ফগ তখনো অবিচলিত রইলেন, যেন কিছুই হয়নি। দৃঢ়স্বরে ম্যাজিস্ট্রেটকে জানালেন: 'আমি জামিন চাই।'

'এখানে আপনাদের কেউ চেনে না। এক-এক জন পনেরো হাজার টাকা দিতে রাজি থাকলে জামিন দেয়া যেতে পারে।'

ফিক্সের বুক দুরুদুরু ক'রে উঠলো। তিনি ভাবলেন, ফগ কি এতই নির্বোধ যে এক মুহূর্তে এত টাকা নষ্ট করবে!

ফিলিয়াস ফগ কিন্তু দ্বিরুক্তি না-ক'রে ব্যাগ থেকে একতাড়া নোট বের ক'রে পেশকারের টেবলের উপর রেখে বললেন: 'টাকাটা আমি এক্ষুনি দাখিল করতে চাই।'

ম্যাজিস্ট্রেট জানালেন: 'বিচারের দিন হাজির হ'লেই টাকাটা আপনারা ফেরৎ পাবেন, এখনকার মতো আপনারা জামিনে খালাশ হলেন।'

ফিক্স বিমূঢ় হ'য়ে গেলেন ব্যাপার দেখে।

মুহ্যমান পাসপার্তুর্তের দিকে তাকিয়ে ফগ বললেন: 'চ'লে এসো পাসপার্তু্ত।'

একটা বাজতে তখন মাত্র আধঘণ্টা বাকি। ফিলিয়াস ফগ একটা গাড়িতে উঠে জাহাজ-ঘাটের দিকে ছুটলেন।

বিমূঢ় ভাব অপসৃত হ'তেই ফিক্স ফগের অনুসরণ করলেন। তখনো তিনি আশা করছিলেন ফগ নিশ্চয়ই সময়-মতো এসে হাজির

হবেন, অত টাকা কিছুতেই জলে ফেলবেন না। কিন্তু যখন দেখলেন ফিলিয়াস ফগ তাঁর সঙ্গিনী ও পাসপার্তুতকে নিয়ে 'রেঙ্গুন' জাহাজে উঠলেন, তখন ক্ষোভে নিজের চুল ছিঁড়তে-ছিঁড়তে বললেন: 'উঃ! কী ভয়ানক লোক! এক মুহূর্তে অত টাকা নষ্ট করলে! নিশ্চয়ই ও দস্যু! যদি দরকার হয় তবে ওর সঙ্গে পৃথিবীর শেষ সীমায় পর্যন্ত যেতে দ্বিধা করবো না! হেস্তনেস্ত একটা করতেই হবে!'

'এস. এস. রেঙ্গুন' ছিলো মংগোলিয়ার মতোই দ্রুতগামী। কিন্তু আরোহীদের থাকবার বন্দোবস্ত ছিলো মংগোলিয়াতেই ভালো। যাতে আউদার কোনো অসুবিধে না-হয়, সেজন্যে ফগ বিশেষ বন্দোবস্ত করলেন।

আউদা ক্রমশ ফগের ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠলেন। প্রাণ-রক্ষার জন্যে সর্বদাই কৃতজ্ঞতা জানাতেন ফগকে। একদিন কথা প্রসঙ্গে বললেন, বোম্বাইয়ের বড়ো ব্যবসায়ী স্যর জামসেদজি জিজিভয়ের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা আছে। স্যর জামসেদজির ভাগ্নে থাকে হংকং। আউদা তাঁরই আশ্রয়ে যেতে চান। কিন্তু, আউদাকে তিনি গ্রহণ করবেন কি না, কে জানে? যদি গ্রহণ না-করেন, তাহ'লে নিজের দশা কী হবে সেই ভাবনায় আউদাকে ব্যাকুল হ'য়ে পড়তে দেখে ফগ বললেন, 'সেজন্যে ভাববেন না। সবই ঠিক হ'য়ে যাবে।'

'রেঙ্গুন' জাহাজে সমুদ্রযাত্রার প্রথম ভাগ ভালো ভাবেই কেটে গেলো। দেখতে-দেখতে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ পেছনে ফেলে তরতর ক'রে জল কেটে-কেটে 'রেঙ্গুন' এগোতে লাগলো।

শিকার হাতছাড়া হ'য়ে যায় দেখে বিলেতের ওয়ারেন্ট হংকং-এ পাঠানোর নির্দেশ দিয়ে ফিক্সও 'রেঙ্গুনে' উঠেছিলেন। পাছে পাসপার্তুতের সঙ্গে জাহাজে দেখা হ'য়ে যায়, এই ভয়ে খুব সাবধানে থাকতে লাগলেন তিনি। হংকংই হ'লো তাঁর শেষ আশার জায়গা। দস্যুকে হংকংএ ধরতে না-পারলে আর ধরা যাবে না। হংকং-এর

পরই তো চীন, জাপান, আমেরিকা। সাধারণ একটা ওয়ারেন্ট ব্রিটিশ এলাকার বাইরে চলবে না। এসব জায়গায় দস্যুকে গ্রেপ্তার করতে হ'লে বিশেষ ওয়ারেন্ট আনতে হবে, সেজন্যে সময় চাই প্রচুর। তদ্দিনে ফিলিয়াস ফগ যে কোথায় লুকিয়ে পড়বেন, কে জানে!

ফিক্স মহা সমস্যার মধ্যে পড়লেন। হাজার চেষ্টা ক'রেও এতক্ষণের মধ্যেও ফগের চুলের ডগাটি পর্যন্ত স্পর্শ করা গেলো না। হংকং-এ যদি দস্যুকে পাকড়াও করা না-যায়, তবে তো সুনাম নিয়েই টানাটানি প'ড়ে যাবে। যে-ক'রেই হোক হংকং-এ কিস্তিমাৎ করতেই হবে। পাসপার্তুকে সব কথা খুলে বলা উচিত হবে কি না, ভাবতে লাগলেন ফিক্স। বললে সে হয়তো দস্যুর সঙ্গ ছেড়ে দিয়ে ফিক্সকেই সাহায্য করবে। কিন্তু, যদি না-করে? যদি ফগকে ফিক্সের মৎলব ফাঁক ক'রে দেয়! তবেই এত হায়রানি পণ্ড হ'য়ে যাবে। না,—নেহাৎ দায় না-ঠেকলে কোনো কথা প্রকাশ করা চলবে না ব'লেই ফিক্স ঠিক করলেন।

ফগের নতুন সঙ্গিনীটি কে, সে-প্রশ্নও ফিক্সের মনে আলোড়ন তুললো। তিনি বুঝতে পারলেন, বোম্বাই থেকে কোলকাতার পথেই ভদ্রমহিলা জুটেছেন। ভদ্রমহিলা অপূর্ব সুন্দরী—বোধহয় এঁর জন্যেই ফগ টাকা চুরি ক'রে পালিয়ে যাচ্ছেন। এবার সব সমস্যার উপর ফিক্স একটি আলোকসম্পাত করতে পারলেন। টাকা চুরি ক'রে এই ভদ্রমহিলাকে নিয়ে ফগ অন্য কোথাও চ'লে যাবার মৎলব এঁটেছেন। ভদ্রমহিলা বিবাহিতা কি না সে প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামালেন না ফিক্স। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারলেন, ভদ্রমহিলাকে অপহরণ ক'রে ফগ নিয়ে যাচ্ছেন। অমনি এক মৎলব মাথায় খেলে গেলো ফিক্সের। নারীহরণের অপরাধে তো ফগকে গ্রেপ্তার করা যায়!

কী মুশকিল! 'রেঙ্গুন' যে আবার হংকং চলেছে! ফগ যেমন জাহাজ থেকে জাহাজে রেল থেকে রেলে লাফ দিতে-দিতে চলেছেন,

তাতে হংকং-এ বেশি দেরি করবেন ব'লে বোধ হয় না। অবশ্যি একটা কাজ করা যায়। সিঙ্গাপুর থেকে হংকং-এর পুলিশকে তারে খবর পাঠিয়ে প্রস্তুত থাকতে বলা যায়। তাহ'লে জাহাজ হংকং-এ ভিড়বার সঙ্গে-সঙ্গেই ফগকে গ্রেপ্তার করা যাবে। কিন্তু আগে পাসপার্তুতকে ধাপ্পা দিয়ে ভিতরের খবর বার করতে হবে।

এইসব সাত-পাঁচ ভাবতে-ভাবতে ফিক্স জাহাজের ডেকে এসে দেখতে পেলেন, পাসপার্তুত পায়চারি করছে। তাকে দেখেই সাগ্রহে ফিক্স এগিয়ে গেলেন। 'আরে! তুমি যে 'রেঙ্গুন' জাহাজে?'

'কে? মিস্টার ফিক্স যে! সেই বোম্বাইতে আপনার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়েছিলো, না? আপনিও সারা দুনিয়া ঘুরে আসতে বেরিয়েছেন নাকি?'

'উঁহু, ও-সব বদখেয়াল আমার নেই। কিছুদিন হংকং-এ থাকবো ভাবছি।'

'তাই নাকি! তা আপনাকে তো অ্যাদ্দিন ডেকের উপর দেখতে পাইনি! কলকাতা ছেড়েছি তো বেশ কিছুদিন হ'লো।'

'একটু অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিলাম ব'লে এ-কদিন বেরোতে পারিনি। কী জানি কেন, বঙ্গোপসাগর আর ভারত মহাসাগর আমার ধাতে সয় না। সে যাক, মিস্টার ফগ কেমন আছেন?'

'ভালোই আছেন তিনি। ঠিক সময়েই সব কাজ হ'য়ে যাচ্ছে। মাঝে মহা মুশকিলে পড়েছিলাম। আমি হ'লে তো হালই ছেড়ে দিতাম, কিন্তু তিনি আলাদা ধাতুতে গড়া ব'লেই এখনো পিছপা হন নি।' এই ব'লে পাসপার্তুত ফিক্সের কাছে সব-কিছু খুলে বললে। মালাবারের মন্দিরে তার দুর্দশা, খোলবিতে হাতি কেনা, পিল্লাজির মন্দিরে সতীদাহ, কলকাতার আদালতে বিচার ও জামিনে খালাস—সব-কিছুই একে-একে ফিক্সকে বললো সে। ফিক্স এর কিছু-কিছু ভালোই জানতেন। তবু না-জানার ভান ক'রে মনোযোগ

দিয়ে শুনে বললেন : 'আউদা তাহ'লে তোমাদের সঙ্গেই চলেছেন? মিস্টার ফগ কি তাঁকে য়ুরোপ নিয়ে যাবেন নাকি?'

'না, তা কেন? সে কি আর হয় কখনো? হংকং-এ আউদার কে-এক আত্মীয় আছেন। শুনেছি তিনি হংকং-এর একজন বড়ো ব্যবসায়ী। তাঁরই কাছে তাঁকে রাখতে যাচ্ছি আমরা।'

সব শুনে ফিক্স কিন্তু মুষড়ে পড়লেন খুব। হতাশ হ'য়ে ভাবলেন, এ-পথে তাহ'লে কিছুই হবে না!' মুহূর্তের মধ্যে হতাশার ভাব গোপন ক'রে তিনি পাসপার্তুতকে বললেন : 'এসো, এক গেলাশ জিন খাওয়া যাক। অনেকদিন বাদে দেখা হ'লো।'

পাসপার্তুত শুনে তো খুব খুশি। বললে : 'চলুন। দু-এক গেলাস জিন ছাড়া 'রেঙ্গুন' জাহাজে আর কী ক'রে সময় কাটানো যাবে!'

দু-জনে জাহাজের খাবার-ঘরের দিকে এগোলো।

সাত ॥ ডিটেকটিভ ফিক্সের তৎপরতা

এর পরেও জাহাজে পাসপার্তুতের সঙ্গে ফিক্সের অনেকবার দেখা হয়েছিলো। কিন্তু তার রকম-শকম দেখে ফিক্স আর তার কাছ থেকে খবর বার করবার চেষ্টা করলেন না। কিন্তু তবুও ব্যাপারটা আর সোজা ভাবে নিতে পারলো না পাসপার্তুত। সে ভাবতে লাগলো : 'আমরাও যেখানে যাই, ফিক্সকেও সেখানে দেখা যায়। ব্যাপারটা বড্ডো ঘোরালো তো! নিশ্চয়ই ও একটা স্পাই! ফগ সত্যি-সত্যিই পৃথিবী ঘুরছেন কি না, তাই ও গোপনে দেখে যাচ্ছে।' সে বড্ডো চ'টে উঠলো। ফিলিয়াস ফগের মতো একজন ভদ্রলোকের পিছনে টিকটিকি লাগানো! সে মনে-মনে ঠিক করলো : আচ্ছা, আমিও দেখবো ফিক্স কতো শক্তি ধরে, আর রিফর্ম ক্লাব কত বড়ো ক্লাব!

এই আবিষ্কারে মনে-মনে খুশিই হ'য়ে উঠলো সে। ঠিক করলো যে, যখুনি সুবিধে পাবে, তখুনি টিকটিকি-সাহেবের সঙ্গে মোলাকাত ক'রে নেবে।

তিরিশে অক্টোবর বুধবার বিকেলবেলা 'রেঙ্গুন' মালাক্কা প্রণালীতে ঢুকলো। পরদিন ভোর চারটেয় নির্দিষ্ট সময়ের বারো ঘণ্টা আগেই পৌঁছুলো সিঙ্গাপুরে। জাহাজের লোকজন কয়লা তুলতে লাগলো জাহাজে। ফিলিয়াস ফগ হাতে কিছু সময় পেয়ে খুশি হ'য়ে আউদাকে নিয়ে বন্দরে নামলেন শহরটা ঘুরে দেখবার জন্যে। ফিক্স অবশ্যি তাঁদের পিছু নিতে ছাড়লেন না। পাসপার্তু ফিক্সকে পিছু নিতে দেখে মনে-মনে বেশ খানিকটা হেসে নিলে।

বেলা এগারোটার সময় 'রেঙ্গুন' কয়লা তোলা শেষ ক'রে নোঙর তুললো। কয়েক-ঘণ্টা বাদেই জাহাজের আরোহীদের দৃষ্টি থেকে মালাক্কার উঁচু পাহাড়গুলো দিগন্তে বিলীন হ'য়ে গেলো। হংকং তখনো তেরোশো মাইল দূরে। ফিলিয়াস ফগ মনে-মনে হিশেব ক'রে নিলেন যে, দিন-ছয়েকের ভিতরেই হংকং পৌঁছনো যাবে, আর ছয়ই নভেম্বরের ভিতরে অনায়াসেই ইয়োকোহামার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া যাবে।

এতোদিন অবধি ভালোই ছিলো আবহাওয়া। হঠাৎ অল্প-অল্প ঝড় শুরু হ'লো। জাহাজের গতি দ্বিগুণ করা হ'লো। তরতর ক'রে জল কেটে এগিয়ে চললো 'রেঙ্গুন'। কিন্তু তুফানও বেড়েই চললো। তুফান সামলে চলতে গিয়ে 'রেঙ্গুনে'র গতি কিছুটা ক'মে এলো। পেনিনস্যুলার অ্যাণ্ড ওরিয়েন্টাল কোম্পানির জাহাজিরা কিন্তু খুব ওস্তাদ। ওস্তাদ নাবিকেরা তাদের যতটুকু সাধ্যে কুলোয় তার চেয়েও বেশি করতে লাগলো। পাসপার্তু কিন্তু তা সত্ত্বেও জাহাজের ক্যাপ্টেনকে মনে-মনে গাল পাড়তে লাগলো। আউদাও খুব চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন। কিন্তু ফিলিয়াস ফগের ভাবলেশহীন মুখে কোনো ভাবান্তর দেখা গেলো না।

ওদিকে ফিক্স কিন্তু তাঁর গোয়েন্দাগিরি কখনো ছাড়েন নি। একদিন ফিক্স কথাপ্রসঙ্গে পাসপার্তুতকে শুধোলেন: 'কী হে! হংকং-এ পৌঁছবার জন্যে তোমরা দেখি বড্ড বেশি ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছো ব'লে মনে হচ্ছে!'

পাসপার্তুত মনে-মনে চ'টে উঠে ছোট্ট একটা জবাব দিলে: 'হ্যাঁ।'

'মিস্টার ফগ কি সেখান থেকেই ইয়োকোহামার জাহাজ ধরবেন? সেজন্যেই বুঝি তিনি খুব উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়েছেন?'

পাসপার্তুত এবারও ছোট্ট জবাব দিলে: হ্যাঁ।'

'আচ্ছা হে, এই রহস্যময় পৃথিবী-ভ্রমণের কথা কি তোমার বিশ্বাস হয়?'

'নিশ্চয়ই বিশ্বাস হয়। কেন? আপনার বুঝি বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'মোটেই না।'

পাসপার্তুত রেগে উঠে বললে: 'হুঁ, সেয়ানা কুকুর!'

ওর কথা শুনে ঘাবড়ে গেলেন ফিক্স। 'তাহ'লে কি আমি যে ডিটেকটিভ সে-খবর প্রকাশ হ'য়ে গেছে নাকি?' কিন্তু কেউ তো জানে না যে আমি ডিটেকটিভ! তাহ'লে লোকটা জানলো কী করে?' সেদিন আর কোনো কথা জিগেস করতে সাহসে তাঁর কুলোলো না।

কিন্তু পাসপার্তুত নাছোড়বান্দা। আরেকদিন সে নিজেই শুধোলো: 'তাহ'লে মিস্টার ফিক্স, হংকং-এও কি আপনাকে আমাদের পিছনে দেখবার সৌভাগ্য হবে?'

ওর কথা বলার ধরন দেখে ফিক্স একটু কিন্তু-কিন্তু করলেন। পাসপার্তুত বললে: 'আপনি যদি আমাদের সঙ্গে থাকেন বরাবর—উঃ, তাহ'লে কী খুশিটাই না হবো! চলুন না আমাদেরই সঙ্গে। পেনিনসুলার অ্যাণ্ড ওরিয়েন্টাল কোম্পানির এজেন্টের পক্ষে মাঝপথে থেমে যাওয়াটা কি ভালো দেখায়? আপনার লক্ষ তো

গোড়ায় ছিলো বোম্বাই অবধি, এখন তো দেখছি চীনেই এসে পড়েছেন প্রায়। আর ঐ তো আমেরিকা! আর সেখান থেকে য়ুরোপ? সে তো ব্যাঙের লাফের এক লাফ!'

ফিক্স তীব্র চোখে ওর দিকে তাকালেন, কিন্তু ওর চোখে সন্দেহ-জনক কিছু না দেখতে পেয়ে বললেন: 'তা···হ্যাঁ-ও, না-ও। এ-চাকরিতে ভালো খারাপ দুই-ই আছে।···তুমি নিশ্চয়ই জানো আমি নিজের পয়সায় শখ ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছি না?'

পাসপার্তু হেসে বললে: 'সে আর আপনাকে বলতে হবে না।'

ফিক্স ওকে আর ঘাঁটানো সুবিধের মনে না ক'রে নিজের কেবিনে এসে ঢুকলেন। রাজ্যের ভাবনা-চিন্তা এসে তাঁকে বিব্রত ক'রে তুললো। 'তাহ'লে ও আমাকে চিনে ফেলেছে'—একথা ভাবতে-ভাবতে তাঁর মাথায় এক মতলব খেলে গেলো। 'ও যখন আমাকে চিনেই ফেলেছে, তখন হংকং-এ নেমেই আমার সব কথা ওকে খুলে বলবো। হয়তো ও ঐ চোরটার কীর্তি-কাহিনী জানে না। ওর কাণ্ড-কীর্তির কথা শুনলে ওকে পুলিশে দিতে ও আমাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করবে।'

ওদিকে ফিলিয়াস ফগ তখন ঝড়ে-মেতে-ওঠা সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে ছিলেন স্থিরচোখে। যাত্রার মধ্যে এ-রকম বিঘ্ন দেখা দিলে বিচলিত হ'য়ে পড়ারই কথা—বিশেষ ক'রে এ-রকম ব্যাপারে। কিন্তু ফগের মুখে চিন্তার কোনো চিহ্নই দেখা গেলো না, বরং দেখা গেলো কঠিন আত্মবিশ্বাসের সুস্পষ্ট লক্ষণ।

পাসপার্তু কিন্তু খুব অস্থির হয়ে পড়লো। সে 'রেঙ্গুনে'র নাবিকদের সাধ্যাতীত সাহায্য করতে লাগলো। তার কর্মপটুতা দেখে সবাই রীতিমতো বিস্মিত হ'য়ে পড়লো। আউদাও ফিলিয়াস ফগের এ-বিপদে ঘাবড়ে গেলেন খুব।

তুফান অবিশ্যি শেষ অবধি থেমে গেলো, কিন্তু 'রেঙ্গুন' গিয়ে হংকং পৌঁছলো ঠিক সময়ের পুরো একদিন পরে। ইয়োকো-

হামার জাহাজ বুঝি ছেড়ে গিয়েছে! পাসপার্তু আর খবর-টবর নিতে সাহস করলো না। যদি শোনা যায় যে জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে, তবে উপায়? এর চেয়ে মনে-মনে আশা রাখাই ভালো। দুঃসংবাদ শুনতে পাওয়ার চেয়ে কোনো সংবাদ না-জানাই তার কাছে ভালো ব'লে মনে হ'লো। ফিক্স অবশ্যি ওদের এই দুরবস্থায় খুশি হ'য়ে মনে-মনে প্রার্থনা করতে লাগলেন, যে ইয়োকোহামার জাহাজ যেন ওরা পৌঁছুবার আগেই ছেড়ে দেয়।

বন্দরের পাইলট জাহাজে উঠলে একটুও বিচলিত না হয়ে ফিলিয়াস ফগ জিগেস করলেন: 'ইয়োকোহামার জাহাজ কি চ'লে গিয়েছে?'

'না। জাহাজের বয়লার খারাপ হ'য়ে গিয়েছিলো ব'লে যেতে পারে নি।'

'কখন ছাড়বে তা'হলে?'

'কাল সকালে জোয়ার এলে ছাড়বে।'

ফিলিয়াস ফগ শুধোলেন: 'জাহাজটার নাম কী?'

পাইলট জবাব দিলো: 'কর্নাটিক।'

ফগ তাকে ধন্যবাদ জানালেন। পাসপার্তু তো আনন্দে তার হাত সজোরে চেপে বললে: পাইলট, আপনি খুব ভালো মানুষ!'

পাইলট এভাবে সম্মানিত হবার কোনো কারণ বুঝতে না পেরে অবাক হ'লো বটে, কিন্তু কারণ জানবার অপেক্ষা না ক'রেই শিস দিতে-দিতে তার কাজে চ'লে গেলো। বেলা একটার সময় 'রেঙ্গুন' জেটিতে এসে লাগলো। যাত্রীরা সব ওঠা-নামা করতে লাগলো।

অদৃষ্ট যে ফিলিয়াস ফগের উপর খুব খুশি, এ-কথা কোনো মতেই অস্বীকার করা যায় না। জাহাজের বয়লারটা যদি খারাপ না হ'তো, তবে জাহাজ দিতো ছেড়ে, আর তার পরের জাহাজের অপেক্ষায় সময় নষ্ট হ'তো আট দিন। এ-কথা অবিশ্যি সত্যি যে তাঁকে চব্বিশ ঘণ্টা ক্ষতি ক'রে যেতে হয়েছে, কিন্তু সেজন্যে বিশেষ কোনো লোকশান

হবে না। যে জাহাজ ইয়োকোহামা থেকে সানফ্রান্‌সিস্কো যাওয়া-আসা করে, হংকং-এর জাহাজ না পৌঁছুলে পর তার ছাড়বার নিয়ম ছিলো না। যদিও এই পঁয়ত্রিশ দিনে ফগ তাঁর হিশেবের চেয়ে এক দিন বেশি সময় লাগিয়েছেন, তবু প্রশান্ত মহাসাগরের বুকের উপর দিয়ে বাইশ দিনের যাত্রায় সেটুকু সেরে নেবার ভরসা আছে।

পরদিন ভোর পাঁচটার আগে 'কর্নাটিক' তো হংকং ছাড়বে না, কাজে-কাজেই শহরে যেটুকু কাজ ছিলো সেটুকু সেরে নেওয়ার জন্যে ষোলো ঘণ্টা সময় পাওয়া গেলো। সোজা কথায়, আউদার ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্যে ফগ ষোলো ঘণ্টা সময় পেলেন হাতে।

জাহাজ জেটিতে লাগার সঙ্গে-সঙ্গেই ফগ আউদাকে নিয়ে নামলেন জাহাজ থেকে। তারপর একটা ভালো হোটেলের খোঁজ ক'রে গেলেন সেখানে। সেখানে পাসপার্তুতকে তাঁর না ফেরা পর্যন্ত হোটেলে থাকবার নির্দেশ দিয়ে তিনি চললেন স্টক একচেঞ্জের সন্ধানে। তিনি ভেবেছিলেন যে জিজিভয়ের ভাগ্নে যখন খুব বড়ো ব্যবসায়ী, তখন সেখানে নিশ্চয়ই তাঁর খবর পাওয়া যাবে।

তাঁর খবর অবিশ্যি ফগ পেলেন, কিন্তু দেখা পেলেন না। টাকা-পয়সা ক'রে নিয়ে তিনি বছর-দুই আগে য়ুরোপ চ'লে গেছেন। ওলন্দাজদের সঙ্গে তাঁর কারবার ছিলো, খুব সম্ভব তিনি চীন থেকে হল্যাণ্ডেই গিয়েছেন।

তক্ষুনি হোটেলে ফিরে ফিলিয়াস ফগ আউদাকে সব খুলে বললেন। সব শুনে তো আউদা খানিকক্ষণ মুহ্যমান হ'য়ে রইলেন। তারপর গালে হাত দিয়ে খানিকক্ষণ ভেবে নিয়ে কাঁপা গলায় তিনি শুধোলেন : 'তাহ'লে মিস্টার ফগ ? আমার উপায় ?'

'এ তো খুব সাধারণ ব্যাপার।' ফগ জবাব দিলেন : 'চলুন না য়ুরোপেই।'

'কিন্তু···কিন্তু তাতে আপনার একটা অসুবিধে···'

'না, না ! ও কী বলছেন ! আপনি থাকলে আমার প্ল্যানের

কোনো ক্ষতিই হবে না।' এই ব'লে তিনি পাসপার্তুতকে ডাকলেন। বললেন : 'কর্নাটিক' জাহাজের তিনটে কেবিন রিজার্ভ ক'রে এসো শিগগির।'

পাসপার্তুত তক্ষুনি হাল্কা মনে টিকিট ক'রতে রওনা হ'লো। পকেটে হাত ঢুকিয়ে শহর দেখতে-দেখতে এগিয়ে চললো ভিক্টোরিয়া বন্দরের দিকে। রাস্তায় চীনা, জাপানি, আর য়ুরোপীয়দের ভিড়। হংকং অনেকটা বোম্বে, কলকাতা কিংবা সিঙ্গাপুরের মতন সে-হিশেবে।

পাসপার্তুত ক্যান্টন নদীর মুখে ভিক্টোরিয়া বন্দরে এসে হাজির হ'লো। যে-বন্দর থেকে 'কর্নাটিক' ছাড়বে, পাসপার্তুত সেখানে এসে দেখলো, ডিটেকটিভ ফিক্স ভাঙা মনে পায়চারি করছেন। পাসপার্তুত মনে-মনে বললে : 'হুঁ! রিফর্ম ক্লাবের ভদ্রলোকের গতিক-সতিক বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না!' সে হাসতে-হাসতে ফিক্সের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

ফিক্স কিন্তু বিনা কারণে ওভাবে মুখভঙ্গি ক'রে পায়চারি করছিলেন না। তখনো বিলেত থেকে ওয়ারেন্ট এসে পৌঁছোয়নি। কয়েকদিন হংকংএ না-থাকলে ওয়ারেন্ট পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। হংকং হচ্ছে ইংরেজের দখলে এদিককার শেষ জায়গা—কাজেই হংকং-এ দস্যুকে ধ'রতে না পারলে তাকে পরে ধরবার সুযোগ নেই। কাজেই ফিক্স তখন সেই মহাসংকটে প'ড়ে কী অস্থির চিন্তায় পাগলের মতো হ'য়ে উঠেছিলেন, তা কেবল ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে না।

পাসপার্তুত সেদিকে খেয়াল না ক'রে হেসে শুধোলে : 'কী মিস্টার ফিক্স? আপনি তাহ'লে আমাদের সঙ্গেই আমেরিকা যাচ্ছেন?'

দাঁত কিড়মিড় ক'রে ফিক্স বললেন : 'হ্যাঁ।'

অট্টহাসিতে ভেঙে পড়লো পাসপার্তুত : 'আসুন, আসুন!

আমি কি আগেই বলি নি, আপনি আমাদের ছাড়তে পারবেন না। আসুন, আসুন—আপনার প্যাসেজ বুক ক'রে নিন।'

' দু-জনে তখন কোম্পানির আপিশ-ঘরে গিয়ে চারখানা কামরা রিজার্ভ ক'রে এলো। কেরানীবাবু তাদের বললেন যে, 'কর্নাটিক'এর মেরামত শেষ হ'য়ে গেছে, কাজে-কাজেই পরদিন ভোরে জাহাজ না ছেড়ে সেদিনেই সন্ধে আটটার সময় জাহাজ ছাড়বে।'

পাসপার্তু বললে : 'তাহ'লে তো খুব ভালো হ'লো! মিস্টার ফগের প্ল্যানের সঙ্গে চমৎকার খাপ খাবে এ। যাই ওঁকে জানিয়ে আসি।'

সেই মুহূর্তে মন ঠিক ক'রে ফেললেন ফিক্স। ভাবলেন, এই মুহূর্তে পাসপার্তুকে সব কিছু খুলে বলবেন, নইলে এ-জীবনে আর হবে না। পথে বেরিয়ে জাহাজঘাটার কাছে একটা রেস্তোরাঁ দেখে ফিক্স বললেন : 'এসো হে, কিছু জলযোগ ক'রে নেয়া যাক।' পাসপার্তু দ্বিরুক্তি না-ক'রে ওঁর সঙ্গে রেস্তোরাঁয় ঢুকলো।

রেস্তোরাঁটা বেশ বড়ে-সড়ো। ওরা দু-জনে একটা সুসজ্জিত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলো। ঘরটার একপাশে একটা ক্যাম্প-খাট। পাসপার্তু দেখলো কতগুলো লোক সেই বিছানায় ঘুমিয়ে রয়েছে। আরো জনকয়েক লোক ছোটো-ছোটো টেবলের চারপাশে ব'সে কেউ বিয়ার বা পোর্ট কেউ ব্র্যাণ্ডি কেউ-বা অন্য কোনো পানীয় গলাধঃকরণ করতে-করতে গল্প করছিলো। অনেকে মাটির তৈরি লাল-রঙা বড়ো-বড়ো নলচেতে গোলাপ-জলে ভিজোনো আফিং-এর ধূমপান করছিলো, যারা আফিং-এর নেশায় জ্ঞান হারিয়ে টেবলের নিচে পড়ে যাচ্ছিলো, ওয়েটারেরা তাদের ধরাধরি ক'রে ক্যাম্প-খাটে শুইয়ে দিচ্ছিলো। পাসপার্তু দেখলো, জন-কুড়ি লোক সেই বিছানায় ওভাবে জ্ঞান হারিয়ে পাশাপাশি শুয়ে রয়েছে।

ফিক্স আর পাসপার্তু সব দেখে-শুনে বুঝতে পারলো এটি রেস্তোরাঁ নয়, চীনেদের একটা গুলির আড্ডা। চীনা গভর্মেন্ট

অনেক চেষ্টা ক'রেও এই নরককুণ্ডগুলোকে বন্ধ ক'রে দিতে পারেনি। ওরা দু-জনে দুটো চেয়ার দখল ক'রে বসলো। পাস-পার্তুতের কাছে টাকাকড়ি ছিলো না। ও ফিক্সের বন্ধুত্বের খাতিরে এখানে এসেছিলো।

দু-বোতল পোর্টের হুকুম দিয়ে ফিক্স পাসপার্তুতকে নানান ধরনের গল্প বলতে লাগলেন। পাসপার্তুত বোতলকে বোতল একাই সাবাড় করে দিলে,—ফিক্স চালাকি ক'রে ওকে বেশি মদ খাইয়ে নিজে নামমাত্র ছুঁলেন কি না-ছুঁলেন। হঠাৎ পাসপার্তুতের খেয়াল হ'লো যে জাহাজ ছাড়বার সময় বদলে গিয়েছে। সে তক্ষুনি উঠে বললে: 'জাহাজ তো সন্ধের সময় ছাড়বে। আমি উঠি। সাহেবকে খবর দিতে হবে।'

ফিক্স তাকে বাধা দিয়ে বললেন: 'এক মিনিট অপেক্ষা করো।'

'কেন? কোনো দরকার আছে কি?'

'তোমার সঙ্গে একটা সাংঘাতিক জরুরি ব্যাপারে কথা বলতে চাই।'

'সাংঘাতিক জরুরি ব্যাপার? সেকি? তা বেশ। কাল সকালেই এ নিয়ে আলাপ করা যাবে'খন। আজ আর আমার সময় নেই।'

'থামো।' ফিক্স বললেন: 'কাল শুনলে চলবে না। কথাটা তোমার সাহেবের সম্বন্ধেই।'

ফিক্সের গলার স্বরে খানিকটা অবাক হ'য়ে তীব্র দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকালো পাসপার্তুত। 'সাহেবের সম্বন্ধে? বেশ, বলুন।' ও আবার চেয়ারে বসলো।

ফিক্স পাসপার্তুতের হাত ছুঁয়ে নিচু গলায় বললেন: 'আমি কে, তুমি কি তা বুঝতে পেরেছো?'

মুচকি হাসলো পাসপার্তুত। 'নিশ্চয়ই পেরেছি।'

'তাহ'লে আমি তোমাকে সব-কিছু খুলেই বলি—'

'সব-কিছুই আমার জানা আছে। না, একে বুদ্ধিমানের কাজ

বলা চলে না মোটেই। আচ্ছা বলুন, কী বলবেন। কিন্তু তাঁর যে আপনাকে পাঠিয়ে খামকা হয়রান হচ্ছেন আর এতো টাকা—'

'খামকা!' ফিক্স উত্তেজিত হ'য়ে উঠলেন। 'তাহ'লে বেশ বোঝ যাচ্ছে কতো টাকার মামলা, তা তুমি জানো না।'

পাসপার্তু জবাব দিলো: 'জানি কতো টাকা। কুড়ি হাজার পাউণ্ড, মানে তিন লাখ টাকা তো?'

ওর হাতে সজোরে ঝাঁকুনি দিয়ে ফিক্স বললেন: 'পঞ্চান্ন হাজার পাউণ্ড!'

'কী?' পাসপার্তু চেঁচিয়ে উঠলো, 'কী বললেন? পঞ্চান্ন হাজার? তাহ'লে তো এখানে একমুহূর্ত সময় নষ্ট করাও অন্যায়!' ও উঠে দাঁড়াতেই ফিক্স আবার ওকে টেনে বসিয়ে বললেন: 'হ্যাঁ, পঞ্চান্ন হাজার পাউণ্ড।' পাসপার্তুর দিকে মদের গ্লাসটা এগিয়ে দিলেন তিনি। 'পঞ্চান্ন হাজার পাউণ্ড। আর আমি যদি সফল হই তাহ'লে পাবো দু-হাজার পাউণ্ড। তুমি যদি আমাকে সাহায্য করো, তাহ'লে তোমাকেও পাঁচশো দেবো।'

'আপনাকে সাহায্য করবো?' অবাক হ'য়ে তাঁর দিকে তাকালো পাসপার্তু। 'তার মানে?'

'হ্যাঁ, সাহায্য করবে। যাতে মিস্টার ফগ এখানে কয়েকটা দিন থাকেন, তার ব্যবস্থা ক'রতে হবে।'

'কী!' চেঁচিয়ে উঠলো পাসপার্তু। 'আপনি বলছেন কী? আমার মনিব ভালো মানুষ মিস্টার ফগের পিছনে স্পাই লাগিয়েও তাঁদের তৃপ্তি হয়নি, আবার যাতে ঠিক সময়ে লণ্ডনে পৌঁছুতে না পারেন, তার ব্যবস্থাও করতে চান? ছি-ছি-ছি!'

'তোমার কথা তো আমি বুঝতে পারছিনে!'

'উঃ! কী ছোটো নজর!' পাসপার্তু বলে চললো। 'তাহ'লে তো তাঁরা দেখছি মিস্টার ফগের পকেট মারতেও পিছপা হবেন না!'

'আমরা তো ঠিক তাই-ই চাইছি।'

নির্জলা মদ পাসপার্তুতকে ক্রমশ উত্তেজিত ক'রে তুলছিলো। 'এ তাহ'লে একটা ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র! আবার তারাই মিস্টার ফগকে বন্ধু ব'লে পরিচয় দেয়, ভদ্রলোক হিশেবে পরিচিত হয়!' ওর কথা শুনে ফিক্স বড্ডো গোলে পড়লেন। ওর কথা ঠিক বুঝতে পারছিলেন না। পাসপার্তুত রোগ ব'লে চললো: 'এরাই কি-না বন্ধু! এরাই রিফর্ম ক্লাবের সভ্য! মিস্টার ফিক্স, আপনি এখনো সাহেবকে চিনে উঠতে পারেন নি। তাঁর মতো মহৎ লোক ক-টা দেখেছেন আপনি? তিনি যে বাজি ধ'রেছেন, সৎ পথেই তা জিতে নেবেন। তিনি তো আর ঠগ জোচ্চোর নন!'

পাসপার্তুতের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ফিক্স বললেন: 'আমি যে কে তা কি তুমি কিছু বুঝতে পেরেছো?'

'আপনি!' পাসপার্তুত বললে: 'আপনি রিফর্ম ক্লাবের একটা স্পাই! মিস্টার ফগকে পথে আটকে রাখবার জন্যেই আপনি আমাদের পিছু-পিছু কুকুরের মত ছুটে এসেছেন। আমি তো অনেক আগেই আপনাকে চিনেছি, নেহাৎ মনে দুঃখ পাবেন ব'লেই মিস্টার ফগকে কিছু বলিনি। এবার দেখছি বললেই ভালো করতুম।'

ফিক্স তাড়াতাড়ি শুধোলেন: 'তাহ'লে মিস্টার ফগ এর কিছু জানেন না?'

মদের গ্লাসটা এক-চুমুকে শেষ করে পাসপার্তুত বললে: 'না। তিনি এর কিছুই জানেন না।'

ডিটেকটিভ ফিক্স দু-হাতে কপাল টিপে ধ'রে পলকের মধ্যেই নিজের কর্তব্য ভেবে নিলেন। তিনি দেখলেন পাসপার্তুত খুব সরল, নিশ্চয়ই ব্যাংক-লুটে মিস্টার ফগের সাহায্য করেনি। ফিক্স ভাবলেন, 'যদি তাই হয়, তাহ'লে আমার সত্যিকার পরিচয় পেলে ও নিশ্চয়ই আমাকে সাহায্য করবে।' বেশি ভাববার তখন সময়ও ছিলো না। যে ক'রেই হোক মিস্টার ফগকে হংকং-এ আটকে রাখতে হবেই। তক্ষুনি তাঁর কর্তব্য ঠিক ক'রে নিয়ে ফিক্স বললেন:

'শোন, তুমি যা ভাবছো, আমি তা নই আসলে।'

অবাক হয়ে গেলো পাসপার্তু। 'সেকী! তার মানে?'

'আমি স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের ডিটেকটিভ। কী? বিশ্বাস হচ্ছে না? এই ছাখো আমার কার্ড।' ফিক্স মুহূর্তমধ্যে তাঁর কার্ড বের ক'রে সেই হতভম্ব ফরাশির সামনে খুলে ধ'রে বলতে লাগলেন, 'বাজি ধরার একটা মিথ্যে অছিলা তৈরি ক'রে মিস্টার ফগ তোমাকেও ঠকিয়েছেন, আর রিফর্ম ক্লাবের সভ্যদেরও ফাঁকি দিয়েছেন। তুমি যাতে কিছু বুঝতে না পেরে তাঁর সাহায্য করো এই তাঁর মৎলব।'

'তার মানে?' চেঁচিয়ে উঠলো ও। 'এভাবে ফাঁকি দিয়ে কী লাভ ওঁর?'

'লাভ হচ্ছে এই—গত আঠারোই সেপ্টেম্বর ব্যাংক অব ইংল্যাণ্ড থেকে যে পঞ্চান্ন হাজার পাউণ্ড চুরি যায় তা কার কাণ্ড জানো? মিস্টার ফগেরই। দস্যুর যে ফোটো পাওয়া গেছে, মিস্টার ফগের চেহারার সঙ্গে তার হুবহু মিল আছে।'

সজোরে টেবল চাপড়ে উঠলো পাসপার্তু। 'অসম্ভব! এ হ'তেই পারে না! মিস্টার ফগের মতো সজ্জন দুনিয়ায় দুর্লভ!'

'আরে তুমি জানবে কী করে? যেদিন মিস্টার ফগ তাঁর পাগলামো নিয়ে বেরিয়ে পড়েন, তুমি তো সবে সেদিনই তাঁর কাছে চাকরি নিয়েছিলে। মনে করো দেখি, সেদিন তাঁর সঙ্গে কী ছিলো? কোনো জিনিশপত্র সঙ্গে ছিলো কি? কেবল একটা ব্যাগ, আর তার মধ্যে অজস্র ব্যাংক-নোট। তাছাড়া আশি দিনে কি সারা পৃথিবী ঘুরে আসা যায়? তুমি বলো দিখি এ একটা পাগলামো, না অন্য কিছু? এখনো তুমি ওঁকে সাধুপুরুষ বলতে চাও?'

পাসপার্তু কলের পুতুলের মতো বললে: 'অ্যাঁ,-অ্যাঁ—তারপর?'

'দস্যুকে সাহায্য করেছো ব'লে তুমিও কি জেলে পচতে চাও?'

পাসপার্তু দু-হাতে তার কপালের রগ টিপে ধরলো। চোখের

সামনে ঘুরতে লাগলো সারা পৃথিবী। মাথায় যেন ভেঙে পড়লো আকাশ। হতবাক হ'য়ে সে ভাবতে লাগলো : 'কী অসম্ভব কথা! ফিলিয়াস ফগ একজন দস্যু! সেই নির্ভীক বীর পুরুষ একটা সামান্য চোর! চোর? না-না, এ অসম্ভব! কোনোমতেই এ হ'তে পারে না। কিন্তু ফিক্সের কথাও তো একেবারে ফেলে দেয়ার মতো নয়! কিন্তু—কিন্তু তবুও এ অসম্ভব!' রুদ্ধকণ্ঠে সে ফিক্সকে শুধোলো : 'তাহ'লে আপনি আমায় এখন কী করতে বলছেন?'

'আমি এতোদূর অবধি ওকে অনুসরণ ক'রে এসেছি।' ফিক্স বললেন : 'স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা চেয়ে পাঠিয়েছি, কিন্তু আজো সেই ওয়ারেণ্ট এসে পৌঁছোয়নি। তোমাকে শুধু এই ব্যবস্থাই করতে হবে, মিস্টার ফগ যাতে কোনো মতেই হংকং ছেড়ে যেতে না পারেন।'

'কিন্তু…'

বাধা দিয়ে ফিক্স বললেন : 'যদি। পারো তবে তোমাকে এক হাজার পাউণ্ড দেবো।'

'না, না—এ কাজ আমি করতে পারবো না।' পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠলো পাসপার্তু,—চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না উঠতে,—চেয়ারে যেন তার সারা দেহ আটকে গেছে। জড়ানো গলায় সে বললে, 'মিস্টার ফিক্স, আপনার কথা যদি সত্যিই হয়, মিস্টার ফগ যদি দস্যুই হন—তবু আমি তাঁর সঙ্গে বেইমানি করতে পারবো না। আমি এখনো বিশ্বাস করি, তিনি নির্দোষ, সাধু। আমি নিমকহারামি করতে পারবো না। অসম্ভব! সে আমি কোনো মতেই পারবো না।'

'তাহ'লে তুমি রাজি নও?' ফিক্স তাকিয়ে দেখলেন, পাসপার্তু প্রায় মাতাল হ'য়ে পড়েছে। তিনি বললেন : 'বেশ, তাহ'লে আমাদের মধ্যে যে-সব কথাবার্তা হ'লো, সে-সব ভুলে যাও। এসো, তার চিহ্ন হিসেবে আরেক গ্লাস ব্র্যাণ্ডি খাওয়া যাক।'

এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে আর এতো মদ খেয়ে পাসপার্তুতের অবস্থা কাহিল হ'য়ে এসেছিলো। ফিক্স ঠিক করলেন, ওকে কোনো মতেই ফগের কাছে যেতে দেয়া চলবে না। টেবলের উপরেই আফিং-ভরা সেই লালরঙা নলচেগুলো পড়ে ছিলো। ফিক্স তারই একটা তুলে দিলেন পাসপার্তুতের হাতে। এমনিতেই কাহিল হ'য়ে পড়েছিলো পাসপার্তুত, নলে কয়েকবার টান দেবার সঙ্গে-সঙ্গে জ্ঞান হারিয়ে প'ড়ে গেলো মেঝের উপর।

'অবশেষে!' চেঁচিয়ে উঠলেন ফিক্স সানন্দে। 'এবার ফিলিয়াস ফগকে বাগে পেয়েছি! কর্নাটিক জাহাজ ছাড়ার সময় যে বদলে গেছে, সে-কথা ফিলিয়াস ফগ আর জানতেও পারবে না! এবার দেখে নেবো তাকে!'

দাম চুকিয়ে ফিক্স চণ্ডুখানা ছেড়ে রাস্তায় বেরোলো।

আট ॥ ইচ্ছে থাকলে উপায় থাকে

এদিকে চণ্ডুখানায় যখন ফিলিয়াস ফগের ভবিষ্যৎ আশা ধ্বংস হ'য়ে যাচ্ছিলো, তখন তিনি নিশ্চিন্ত মনে আউদাকে নিয়ে সাহেব-পাড়ায় বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। তাঁর অনুরোধে আউদা য়ুরোপে যেতে রাজি হ'য়ে পড়ায় এতো দূর পথ পাড়ি দেওয়ার জন্যে কতোগুলো জিনিশ কেনা-কাটা করা দরকার হ'য়ে পড়েছিলো। ফগের মতো কোনো ইংরেজ হয়তো একটা ব্যাগ সঙ্গে নিয়েই সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়াতে পারেন, কিন্তু কোনো ভদ্রমহিলার পক্ষে তো সেভাবে বেড়ানো সম্ভব নয়!

কেনা-কাটা সারা হ'লে পর হোটেলে ফিরে খাওয়া-দাওয়া সেরে ফগ 'দি টাইমস' আর 'ইলাস্ট্রেটেড লণ্ডন নিউজ' পড়তে লাগলেন। পাসপার্তুত এতো রাতেও ফিরে না-আসায় ফগ চিন্তিত হলেন না, কারণ তিনি জানতেন ইয়োকোহামার জাহাজ আগামীকাল ভোরের

আগে ছাড়বে না। কাজেই পাসপার্তুতকে না দেখতে পেলেও সে নিয়ে ততো মাথা ঘামালেন না। কিন্তু পরদিন ভোরে যখন পাসপার্তুতকে তিনি ডাকলেন, তখনো তার কোনো পাত্তা পাওয়া গেলো না। ফগ অবশ্যি তখনই প্রথম শুনলেন যে আগের দিন রাত্রেও সে আসেনি। তিনি এ-সম্বন্ধে কী ভাবলেন তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন, কারণ তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে জিনিশপত্র গুছিয়ে আউদাকে সঙ্গে নিয়ে কর্নাটিক জাহাজে যাবার জন্যে রাস্তায় এসে নামলেন। জেটিতে এসে শোনা গেলো আগের দিন রাত্রেই কর্নাটিক ছেড়ে গিয়েছে। ফগ একথা শুনে শুধু তাঁর স্বাভাবিক গলায় আউদাকে বললেন: 'এ নিয়ে হতাশ হবেন না। ইচ্ছে থাকলে একটা উপায় হবেই হবে।'

ফিক্স ওদের কাছে দাঁড়িয়ে মনোযোগ দিয়ে সব দেখছিলেন। এবার তিনি ফগের কাছে এসে দাঁড়ালেন। 'আপনিই তো কাল আমাদের সঙ্গে "রেঙ্গুনে" ক'রে এসেছেন, না?'

ফগ বললেন: 'হ্যাঁ—কিন্তু আপনাকে তো ঠিক…'

'মাপ করবেন, ভেবেছিলুম পাসপার্তুতকেও আপনাদের সঙ্গে দেখতে পাবো।'

আউদা ব্যগ্র কণ্ঠে শুধোলেন: 'সে কোথায় আছে আপনি কি জানেন মিস্টার…'

'আমার নাম ফিক্স।' অবাক হবার ভান করলেন তিনি। 'সেকি! ও কি আপনাদের সঙ্গে আসেনি?'

'না। কাল থেকেই তো তার পাত্তা পাচ্ছিনে।' আউদা বললেন: 'আমি ভাবছি সে কি কর্নাটিক জাহাজেই চ'লে গেলো?'

'ও কি আপনাদের ফেলে রেখেই চ'লে যাবে? মাপ করবেন,— আপনারাও বুঝি ঐ জাহাজে যেতে চেয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'আমিও যাবো ব'লে মনে করছিলুম। জাহাজখানা হঠাৎ চ'লে

যাওয়াতে বড্ডো অসুবিধেয় পড়লুম। খবর নিয়ে শুনলুম, মেরামতের কাজ শেষ হ'য়ে যাওয়াতে বারো ঘণ্টা আগেই জাহাজটা হংকং ছেড়ে গিয়েছে। এখন তো হপ্তা-খানেকের মধ্যে আর জাহাজও পাওয়া যাবে না। দেখুন দেখি, কী মুশকিলেই না পড়লুম!' ফিক্সের চোখে শয়তানের হাসির সঙ্গে কুটিল হাসি খেলে গেলো। তিনি ভাবছিলেন, আর এক হপ্তা,—তার মধ্যেই ওয়ারেন্ট এসে পড়বে। আর ভয় কিসের!

কিন্তু ফগ যখন তাঁর স্বাভাবিক শান্ত গলায় বললেন, 'কর্নাটিক ছাড়াও তো হংকং বন্দরে আরো অনেক জাহাজ রয়েছে'—তখন তিনি কী রকম আঘাত পেলেন, পাঠক তা নিশ্চয়ই সহজে অনুমান করতে পারছেন। ফগ আর কালবিলম্ব না ক'রে আউদাকে নিয়ে জাহাজগুলোর পানে চললেন। ফিক্স অবাক হ'য়ে তাঁদের অনুসরণ করলেন। কিন্তু, ফিক্সের উপর বোধহয় অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, নইলে ঘুরতে-ঘুরতে ঘণ্টাতিনেক কেটে গেলো, কিন্তু এতোগুলো জাহাজের মধ্যে কোনো জাহাজের ক্যাপ্টেনই ইয়োকোহামা যেতে রাজি হ'লো না। ফিক্সের মুখে ফের হাসি ফুটলো।

কিন্তু ফিলিয়াস ফগ নাছোড়বান্দা। তিনি তখনো জাহাজ-ঘাটায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। পথে এক জাহাজীর সঙ্গে দেখা। জাহাজী শুধোলো: 'সাহেব কি কোনো জাহাজের খোঁজ করছেন?'

'এক্ষুনি ছাড়তে পারে এমন কোনো স্টীম-বোট আছে তোমার?'

'আছে সাহেব। তেতাল্লিশ নম্বর পাইলট-বোটই আমার। এ-বছরে ওর চেয়ে ভালো নৌকো আর পাবেন না।'

'খুব স্পীডে যেতে পারবে তো?'

'ঘণ্টায় আট-ন' মাইল ক'রে চলে'সাহেব। আসুন না, একবার দেখবেন। দেখলেই আপনার পছন্দ হবে সাহেব। সমুদ্রের মাঝে একটু বেড়ানো-টেড়ানোর জন্যেই বুঝি বোটটা চাই?'

'ঠিক তা নয়। এই ধরো সমুদ্র-পাড়ি দেয়া আর-কী! আমি ইয়োকোহামা যেতে চাই, অবিশ্যি তুমি রাজি হ'লে।'

নাবিক হতভম্ব হ'য়ে ফগের পানে তাকালো। 'আপনি তামাসা করছেন না তো?'

'তামাসা? তামাসা কেন? আমি কর্নাটিক জাহাজ ধ'রতে পারি নি। অথচ চোদ্দ তারিখের মধ্যে আমাকে ইয়োকোহামা পৌঁছোতেই হবে, দেরি হ'লে চলবে না। সেখানে গিয়ে আমাকে সানফ্রান্সিসকোর জাহাজ ধরতে হবে কি-না!'

'খুব দুঃখিত হলাম সাহেব, কিন্তু সে অসম্ভব!'

'আমি দিনে একশো পাউণ্ড ক'রে ভাড়া দেবো। ঠিক সময়ে পৌঁছুতে পারলে আরো দুশো পাউণ্ড বখশিশ পাবে।'

'আপনি কি সত্যিই যাবেন সাহেব?' নাবিকটি জিজ্ঞেস করলো।

ফিলিয়াস ফগ উত্তর করলেন: 'নিশ্চয়ই যাবো।'

নাবিক একবার আকাশের দিকে তাকালো, তারপর আবার তাকালো সেই নিঃসীম সমুদ্রের দিকে। শেষে দোটানায় প'ড়ে ভাবতে ভাবতে পায়চারি করতে লাগলো; একদিকে অতগুলো টাকা, অন্যদিকে জীবনের আশঙ্কা!

ফিক্স তো ব্যাপার-স্যাপার দেখে একেবারে থ! এই বুঝি গেলো সর্বনাশ হ'য়ে!

ফিলিয়াস ফগ আউদার দিকে তাকালেন। 'ছোট্টো নৌকো,— আপনার ভয় করবে না তো?'

'না। আপনার সঙ্গে যেতে আর ভয় কিসের?'

অনেকক্ষণ ভেবে নিয়ে নাবিক বললে: 'আমার ছোটো নৌকো, অতো দূর পাড়ি দিতে তাই সাহস করিনে,—বিশেষ ক'রে এই ঝড়-তুফানের সময়। সকলেরই প্রাণ যেতে পারে বেঘোরে। তা ছাড়া ইয়োকোহামাও তো কম দূর নয় এখান থেকে—ষোলোশো মাইল। সময়-মতো বোধহয় পৌঁছুনোও যাবে না। তবে এক কাজ করা

যেতে পারে। নাগাসাকি এখান থেকে এগারোশো মাইল, সাংহাই আটশো। সাংহাই পৌঁছুলে আমরা তীরের কাছ দিয়েই যেতে পারবো, স্রোতের টানটাও পাবো।'

'কিন্তু, আমাকে যে ইয়োকোহামার আমেরিকার ডাক-জাহাজ ধরতে হবে!'

'বেশ তো, তাই হবে। সানফ্রান্সিসকোর জাহাজ তো আর ইয়োকোহামা থেকে ছাড়ে না,—সাংহাই থেকে ছাড়ে। যেতে-যেতে ইয়োকোহামা আর নাগাসাকিতে দাঁড়ায়।'

'তুমি ঠিক জানো তো?'

'ঠিক জানি। এগারোই নভেম্বর সন্ধ্যাবেলা সাংহাই থেকে জাহাজ ছাড়বে। তাহ'লেই চারদিন সময় আছে হাতে—মানে, ছিয়ানব্বুই ঘণ্টা। যদি ঘণ্টায় আট মাইল ক'রে যেতে পারি আর অনুকূল হাওয়া থাকে, তবে ঠিক সময়েই সাংহাই পৌঁছুতে পারবো।'

ফিক্সের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হ'লো। ঘটনাস্রোত এবার যেভাবে মোড় নিচ্ছে, তাতে দস্যুকে পাকড়াও করার আর কোনো সুযোগ নেই!

ফগ নাবিকটিকে শুধোলেন: 'তোমরা কখন রওনা হ'তে পারবে?'

'এক ঘণ্টার মধ্যে। কিছু খাবার কিনে নৌকোর পালটা বাঁধবো এই যা দেরি।'

'তবে এই কথাই রইলো। তোমারই তো নৌকো?'

'হ্যাঁ আমারই নৌকো। আমার নাম জন বুন্স্বি, নৌকোর নাম 'তংকাদিরি।'

'এই নাও তোমার সুবিধের জন্যে দু-শো পাউণ্ড আগাম দিচ্ছি।' ফগ নাবিকের হাতে একতাড়া নোট গুঁজে দিলেন। ফিক্স কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে ফগ বললেন: 'আপনি যদি ইচ্ছে করেন, তবে—'

'অজস্র ধন্যবাদ আপনাকে। আমিই আপনাকে বলবো মনে করছিলুম।'

'তাহলে আধঘণ্টার মধ্যেই আমাদের তৈরি হ'য়ে নিতে হবে।'

আউদা বিমর্ষকণ্ঠে বললেন : 'কিন্তু পাসপার্তুতের যে কী হ'লো—'

তাঁকে আশ্বস্ত করলেন ফগ। 'আমার যা সাধ্য তা আমি করবো।' পুলিশ আপিশে গিয়ে পাসপার্তুতের চেহারা বর্ণনা ক'রে তার অনুসন্ধানের খরচ ও বিলেতে ফিরে আসবার জন্যে কিছু টাকা রেখে এলেন ফগ।

বেলা তিনটের সময় সমুদ্রে পাড়ি দেয়ার জন্যে তৈরি হ'লো তংকাদিরি। ছোটো-খাটো নৌকো হ'লেও খুব মজবুত আর দ্রুতগামী। বুন্‌স্‌বির অধীনে আরো চারজন নাবিক ছিলো। বুন্‌স্‌বি বেশ দৃঢ়-গঠন, উৎসাহী ও সুদক্ষ নাবিক। তংকাদিরির জন্যে তার একটা অহংকার ছিলো।

ফগ আর আউদা মালপত্র নিয়ে নৌকোয় উঠলেন। ফিক্স আগেই এসে হাজির হয়েছিলেন। তাকে দেখে ফগ বললেন : 'আমি অত্যন্ত দুঃখিত যে, এ নৌকোয় আপনার থাকার ভালো বন্দোবস্ত করতে পারছি নে। চোখ-কান বুজে কোনো রকমে এরই মধ্যে কাটিয়ে দিতে হবে।'

ফিক্স মনে-মনে একটু লজ্জা পেলেন। দস্যুর আতিথ্য গ্রহণ করেছেন ব'লে নিজেকে বড়ো খাটো ব'লে মনে হ'লো তাঁর। মনে-মনে ভাবলেন : 'লোকটা দস্যুই হোক, আর যাই হোক, খুব বিনয়ী আর ভদ্র।' প্রতি মুহূর্তেই তাঁর আশঙ্কা হ'তে লাগলো, যদি হঠাৎ পাসপার্তুত এসে হাজির হয়, তবেই সর্বনাশ হয়ে যাবে।

কিন্তু ফিক্সের বরাত ভালো। নোঙর তুলে দেখতে-দেখতে তংকাদিরি বন্দর ছেড়ে দ্রুতগতিতে ছুটে চললো।

অমন একটা ছোটো নৌকোয় ক'রে সেই ঝড়তুফানের সময় আটশো মাইল সমুদ্র-পাড়ি দেয়া খুব বিপজ্জনক ছিলো নিঃসন্দেহে।

জন বুন্‌স্‌বি টাকার লোভে আর ফিলিয়াস ফগ বাজি জিতবার জন্যে গ্রাহ্যই করলেন না সে বিপদ। ফগের কথার জবাবে বুন্‌স্‌বি একবার শুধু বললো : 'কোনো চিন্তা করবেন না আপনি। বুনস্‌বির উপর আপনি নির্ভর করতে পারেন। আমার যথাসাধ্য আমি করবো।'

তংকাদিরি বেশ দ্রুত বেগেই চলতে লাগলো। ফগ নৌকোয় বসে অথৈ অকূল সাগরে এলোথেলো ঢেউয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আউদা সেই সীমাহীন সমুদ্রের পানে তাকিয়ে একটু ভয় পেলেও তা প্রকাশ করলেন না।

একটু পরেই সন্ধ্যা হ'য়ে এলো। এদিকে আকাশেও তখন অল্প-অল্প কালো মেঘ জমছিলো। হাওয়া বইলো প্রবল বেগে। তবু তংকাদিরি দ্রুতগতিতে ছুটে চলেছে দেখে ফগ একটু আশ্বস্ত হলেন। পুরস্কারের লোভে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো নাবিকেরা।

প্রথম দু'দিন ভালোভাবেই কেটে গেলো, কিন্তু তৃতীয় দিন ভোর থেকেই সঙিন হয়ে উঠলো আকাশের অবস্থা। বিপুল উচ্ছ্বাসে ফুঁসে উঠলো দক্ষিণ দিকের সমুদ্র। বুন্‌স্‌বি ভালো ক'রে চারদিক দেখে ফগকে বললে : 'আমার আশঙ্কা হচ্ছে এক্ষুনি সাংঘাতিক ঝড় হবে। মনে হচ্ছে দক্ষিণ দিক থেকেই আসবে ঝড়—একটা ঘূর্নি-বাতাস আসছে।'

'ভালোই হ'লো। দক্ষিণের ঝড়ে আরো দ্রুত যাওয়া যাবে উত্তরদিকে।'

'আপনি যদি এ-কথা বলেন, তবে আমার আর কিছু বলবার নেই।'

বুন্‌স্‌বির আশঙ্কাই সত্যি হ,য়ে উঠলো। রাত আটটার সময় দক্ষিণ থেকে সাংঘাতিক ঝড় ছুটে এলো। যেমন ভীষণ ঝড়, তেমনি মুষলধারে বৃষ্টি। রাগে খেপে উঠলো সমুদ্র। প্রচণ্ড ঝড় তংকাদিরির ঝুঁটি ধ'রে নাড়তে লাগলো। দুরন্ত আক্রোশে একটা ক্রুদ্ধ বাঘ শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে যেন! রব উঠলো : 'সামাল,

সামাল!' কিন্তু আশ্চর্য বুন্‌স্‌বির নৌকো-চালানোর দক্ষতা! এই সাংঘাতিক ঝড়ে তংকাদিরি আলোড়িত হ'লো বটে, কিন্তু ডুবলো না, ঝড়ের ডাকে তীরের মতো ছুটে চললো সামনের দিকে।

ফিক্স আকাশের অবস্থা দেখে ভাবছিলেন, 'কেন মরতে এলাম! না এলেই ছিলো ভালো!' আউদা খুব ভয় পেলেও ফিলিয়াস ফগের মুখের দিকে তাকিয়ে বুকে সাহস আনবার চেষ্টা করছিলেন। আর ফগ ভাবছিলেন, 'এমন না-হলে নৌকো দ্রুত যেতো কী ক'রে!'

এতোক্ষণ ঝড়ের বেগ ছিলো উত্তর দিকে, এবার হ'লো উত্তর-পশ্চিমে। ঝড়ের তাণ্ডব এতো বেড়ে গেলো যে বুন্‌স্‌বি অন্যান্য নাবিকের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে ফগকে জানালো: 'আমার মনে হয় কাছাকাছি কোনো বন্দরের দিকে না গেলে সাংঘাতিক বিপদ ঘটবে।'

'আমারও তাই মনে হচ্ছে।'

'কোন বন্দরের দিকে যাবো তবে?'

'আমি তো শুধু একটাই চিনি।'

'সেটার নাম কী।'

'সাংহাই।'

জবাব শুনে বুন্‌স্‌বি স্তম্ভিত বিস্ময়ে হতবাক হ'য়ে গেলো। তারপর বললে: বেশ! তাই হবে। আমরা সাংহাই বন্দরেই যাবো।'

তংকাদারি যেমন চলছিলো, তেমনি এগোতে লাগলো। রাত ঘন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র থেকে তীব্রতর হ'য়ে উঠতে লাগলো তুফান। এমন দুর্যোগ বোধহয় কেউ আর দেখেনি। সমুদ্রের সে কী আক্রোশ, সে কী দাপট! তংকাদিরি যে কেন ডুবলোনা সে'ই আশ্চর্য! তংকাদিরি দু'বার ডুবতে-ডুবতে বেঁচে গেলো বটে, কিন্তু নৌকোর মাস্তুল, ছাদ ইত্যাদি সবই উড়ে গেলো। সকালের দিকে হাওয়ার বেগ কিছু কমলো বটে, কিন্তু বইতে লাগলো দক্ষিণ-পূর্ব দিকে। প্রতিকূল হাওয়া কেটে এগোনো একটু কষ্টকর হ'য়ে দাঁড়ালো। দুপুরের দিকে থেমে গেলো তুফান, আকাশ হ'লো অনাবিল নীল। বুন্‌স্‌বি

হিশেব ক'রে দেখলো সাংহাই তখনো প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে। হাতে প্রায় ছ' ঘণ্টা সময় আছে। এই পঞ্চাশ মাইল ছ' ঘণ্টায় পেরোতে না-পারলে জাহাজ ধরা অসম্ভব। বুন্‌স্‌বি চিন্তিত হ'য়ে পড়লো।

এদিকে সমুদ্র তখন নিস্তরঙ্গ। হাওয়ার কোনো চিহ্নই নেই। পালে আর হাওয়া লাগে না। সাংহাই তখনো পঁয়তাল্লিশ মাইল দূরে, আর হাতে মাত্র ছ' ঘণ্টা সময়।

হাওয়া, হাওয়া—একটু হাওয়া! কাল এতো ঝড় বয়েছিলো, হাওয়া ছিলো তীব্রতম, আজ আর কি এক কণাও থাকতে নেই! তংকাদিরির গতি হ'লো অত্যন্ত শ্লথ। ফিলিয়াস ফগের যথাসর্বস্ব নির্ভর করছে তংকাদিরির উপর। কিন্তু ফগ নির্বিকারভাবে চুপ ক'রে ব'সে রইলেন।

দেখতে-দেখতে বাজলো সন্ধ্যা ছ'টা। সূর্য ডুবলো দিগন্তের সমুদ্রে। সাংহাই তখনো তিন মাইলের পথ। বুন্‌স্‌বি আর্তনাদ ক'রে উঠলো, 'আর হ'লো না! পুরস্কার পেয়েও হারালুম!' কাতর চোখে সে তাকালো ফগের দিকে। ফগ নিরুদ্বেগ নির্বিকার চোখে বুন্‌স্‌বির দিকে তাকালেন।

অনতিদূরে দেখা গেলো একটা জাহাজের চোঙ,—ভলকে-ভলকে ধোঁয়া উঠছে সেই চোঙ দিয়ে। জাহাজ দেখেই চিনতে পারলো বুন্‌স্‌বি। আমেরিকাগামী জাহাজ। সে রোষে ক্ষোভে ব'লে উঠলো: 'জাহাজ অথৈ জলে ডুবে যাক!'

ফগ শান্ত গলায় বললেন: 'জাহাজ ডাকো।'

কুয়াশার মধ্যে সংকেত করবার জন্যে তংকাদিরিতে যে পেতলের কামানটা ছিলো, ক্ষিপ্র হাতে বারুদ ঢেলে তার নল ভ'রে তুললো বুন্‌স্‌বি। মাস্তুলে বিপদজ্ঞাপক সাংকেতিক নিশান তুলে বারুদে আগুন দিলো সে।

তংকাদিরির ছোট্ট পেতলের কামান সমুদ্রের নিস্তরঙ্গ শান্তিকে ভেঙে চুরে গর্জন ক'রে উঠলো।

সাতই নভেম্বর হংকং ছেড়েছিলো কর্নাটিক। ফিলিয়াস ফগ যে-তিনটে কেবিন ভাড়া নিয়েছিলেন, তার দুটো খালিই গেলো। আট তারিখের ভোরবেলা কর্নাটিকের নাবিকেরা দেখলো, অসংযত-বেশ একজন আরোহী ডেকের উপর হতবুদ্ধি হ'য়ে ব'সে আছে। লোকটি আর কেউ নয়, আমাদের জঁ৷ পাসপার্তু।

কর্নাটিক যেদিন হংকং ছাড়লো, সেদিন তো পাসপার্তু হংকং-এর এক চণ্ডুখানায় অজ্ঞান হয়ে প'ড়ে ছিলো, তবে জাহাজে এলো কী করে, এই প্রশ্নের উত্তর জানতে হ'লে আবার আমাদের সেই চণ্ডুখানায় ফিরে যেতে হবে।

ফিক্স তো পাসপার্তুকে অচেতন ক'রে রেখে প্রস্থান করলো। তারপরই চণ্ডুখানার দু'জন ওয়েটার এসে তাকে মেঝে থেকে তুলে ঐ ক্যাম্পখাটে শুইয়ে দিলে, তিন ঘণ্টা পরে সামান্য জ্ঞান ফিরলো তার। তখন তার আর কিছুই মনে পড়লো না, শুধু মনে পড়লো কর্নাটিক। তখন প্রায় সন্ধে হয়েছে। পাসপার্তু টলতে-টলতে দেয়াল ধ'রে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো, তারপর যেন স্বপ্নের ঘোরে 'কর্নাটিক,' 'কর্নাটিক' ব'লে চিৎকার করতে-করতে চললো জেটির দিকে। জেটি বেশি দূরে ছিলো না। পাসপার্তু টলতে-টলতে কর্নাটিকের ডেকে গিয়ে উঠলো, আর 'কর্নাটিক,' 'কর্নাটিক' ব'লে বার-বার চেঁচিয়ে উঠেই আবার অচেতন হ'য়ে প'ড়ে গেলো। হংকং-এ যাত্রীদের মধ্যে এরকম ঘটনা প্রায়ই ঘটতো ব'লে নাবিকেরা খুব অবাক হ'লো না, অচেতন পাসপার্তুকে ডেকে তুলে একটা কেবিনের মধ্যে রেখে এলো।

ভোরবেলা সমুদ্রের ঠাণ্ডা হাওয়ায় ধীরে-ধীরে প্রকৃতিস্থ হ'লো পাসপার্তু। মনে পড়লো সব-কিছু। ভাবলো, আমি এমন

মাতাল হয়েছিলুম শুনলে ফগ কী বলবেন! যাহোক, জাহাজে যে উঠতে পেরেছি এই ঢের! ডিটেকটিভ ফিক্স নিশ্চয়ই এখানে আসতে সাহস করেনি! কী আশ্চর্য! ফগের মতো লোককেও দস্যু ব'লে সন্দেহ ক'রে পিছনে টিকটিকি লেগেছে! এ-কথা কি এখুনি ফগকে খুলে বলবো? না, এখন থাক, ডিটেকটিভ আগে আমাদের সঙ্গে-সঙ্গে সারা দুনিয়া ঘুরুক, তারপর লণ্ডনে গিয়ে তাকে নিয়ে বেশ একটা মজা করা যাবে।'

মন ঠিক ক'রে পাসপার্তু ফগের কাছে মাপ চাইবার জন্যে তাঁর কামরার সন্ধানে চললো। সারা জাহাজ পাঁতি-পাঁতি ক'রে খুঁজেও যখন ফগের দেখা পাওয়া গেলো না, তখন সে ভাবলে নেশার ঝোঁকে সে অন্য কোনো জাহাজে উঠেছে—এ নিশ্চয়ই কর্নাটিক নয়। সে একটি নাবিককে শুধোলে: 'এটাই তো কর্নাটিক? ইয়োকোহামা যাচ্ছে?'

নাবিকটি বললে: 'হ্যাঁ।'

তখন হঠাৎ তার মনে পড়লো, জাহাজ ছাড়বার সময় যে হঠাৎ বদলে গিয়েছিলো, সে-খবর তো ফগকে জানানো হয়নি! অনু-শোচনায় ভরে উঠলো তার মন। তার জন্যেই আজ সর্বনাশ হ'লো ফগের! তার জন্যেই ফগ আজ সর্বস্বান্ত, পুলিশের হাতে আটক হ'য়ে হয়তো বা জেলে প'চে মরবেন! পরক্ষণেই ফিক্সের উপর ভয়ানক চ'টে উঠলো সে। কাছে পেলে তখন হয়তো ফিক্সকে ছিঁড়েই ফেলতো পাসপার্তু!

মদের নেশার মতো রাগও ক্রমশ অন্তর্হিত হ'লো তার। এবার নিজের অবস্থার কথা ভাবতে লাগলো সে। আগেই টিকিট করা হয়ে গিয়েছিলো ব'লে ইয়োকোহামা পর্যন্ত তার আর জাহাজ-ভাড়া লাগবে না, খাওয়া-দাওয়ারও ত্রুটি ঘটবে না; কিন্তু তারপর? তার কাছে যে একটা পয়সাও নেই! পাসপার্তু আর বেশি ভাবতে পারলো না।

ফগ ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। 'অন্যেও যেমন জানে, আমিও তেমনি জানি।'

বিদ্রূপে ফেটে পড়লেন কর্নেল। 'বেশ তো, একহাত হ'য়ে যাক না!'

ব্যাপার দেখে আউদার মুখ পাঁশুটে হ'য়ে গেলো। ফগের হাত ধ'রে তাঁকে টেনে বসালেন আউদা। পাসপার্তু'ত রাগে যেভাবে ফুঁসে উঠলো, তাতে মনে হ'লো সে বুঝি কর্নেলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে! ফগকে লক্ষ ক'রে ফিক্স বললেন: 'আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে এঁব আগে আমাকেই হিশেব-নিকেশ করতে হবে—'

ফগ শান্ত গলায় বললেন: 'মাপ কববেন, বোঝা-পড়াটা আগে আমার সঙ্গেই হবে। কী ক'রে হুইস্ট খেলতে হয় তা আমি জানিনে, এ-কথা ব'লে কর্নেল আমাকে অত্যন্ত অপমানিত করেছেন। তিনি নিশ্চয়ই তাব সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দেবেন।'

তীব্রকণ্ঠে কর্নেল বললেন: কৈফিয়ৎ? যেখানে খুশি, যখন ইচ্ছে, যেমন ক'রে চান তাই পাবেন!'

ট্রেন তখন একটা স্টেশনে দাঁড়িয়ে ছিলো। আউদা, ফিক্স ও পাসপার্তুতের কোনো কথা না-শুনে ফগ গাড়ি থেকে নামলেন। কর্নেলও তাঁর অনুসরণ করলেন।

প্ল্যাটফর্মে নেমে ফগ নম্রস্বরে বললেন: 'দেখুন কর্নেল, তাড়াতাড়ি য়ুরোপে ফিরে যাওয়া আমার বিশেষ দরকার। এখানে দেরি হ'লে আমার খুব লোকশান হবে।'

কর্নেল বললেন: 'তাতে আমার কী?'

ফগ আগের মতোই নরম গলায় বললেন: 'সানফ্রান্সিসকোতে আপনার সঙ্গে কলহ হবার পর আমি শপথ করেছিলুম, আমার ইংল্যাণ্ডের কাজ শেষ হ'লেই আমি আপনার খোঁজে আবার আমেরিকায় আসবো।'

তীব্রকণ্ঠে ফেটে পড়লেন কর্নেল। 'বটে!'

'আজ থেকে ছ-মাস পরে আপনার সঙ্গে দেখা হবে কি?'

'ছ-মাস কেন, ছ-বছরই বলুন না!'

'আমি ছ-মাসের কথা বলছি। ছ-মাস পরে আমি ঠিক এখানে হাজির হবো।'

কর্নেল চেঁচিয়ে উঠলেন: 'পাগল, না ক্ষ্যাপা? আমার কথাই হ'লো, নাউ অর নেভার।'

'বেশ তাই হবে। আপনি কি নিউ-ইয়র্কে যাচ্ছেন?'

'আমি যেখানেই যাই না কেন, আপনার তাতে কী? এর পরের স্টেশন হ'লো প্লামফ্রিক। গাড়ি সেখানে দশ মিনিট দাঁড়াবে। গোটাকতোক বন্দুকের গুলি চালাতে সেখানে আর কতো সময় লাগবে?'

'সেই ভালো। আমি প্লামফ্রিকেই নামবো।'

কর্নেল স্পর্ধা ক'রে বললেন, 'সেখান থেকে আর উঠতে হবেনা!'

ধীরে গাড়িতে উঠতে-উঠতে ফগ বললেন: 'কে জানে কী হবে?'

গাড়ি ছেড়ে দিলো। আউদাকে আশ্বস্ত ক'রে ফগ বললেন: 'যারা মুখে বেশি তড়পায়, তাদের কাছে আবার ভয় কী? মিস্টার ফিক্স, এই ডুয়েলে আপনি বোধহয় আমাকে সেকেণ্ড হবেন?'

ফিক্স রাজি হলেন। ফগ আবার নির্বিকারভাবে হুইস্ট খেলা শুরু করলেন। একটু বাদেই যে প্রাণঘাতী ডুয়েল লড়তে হবে, তার কোনো চিহ্নই ফগের মুখে দেখা গেলো না।

এগারোটার সময় ট্রেনের বাঁশি শুনে বোঝা গেলো প্লামফ্রিক স্টেশনে এসে গেছে। ফগ উঠে দাঁড়ালেন। পাসপার্তু আর ফিক্স রিভলভার নিয়ে তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন। ফ্যাকাশে মুখে আউদা মড়ার মতো ব'সে রইলেন আসনে।

পরমুহূর্তেই পাশের কামরার পা-দানিতে দেখা গেলো কর্নেল প্রক্টরকে। একজন আমেরিকান তাঁর দোসর হয়েছিলো। সবাই

ট্রেন থেকে নামবার উদ্যোগ করতেই গার্ড বারণ করলো : 'নামবেন না আপনারা। গাড়ি কুড়ি মিনিট পিছিয়ে পড়েছে। গাড়ি এখানে আর দাঁড়াবে না।'

ফগকে দেখিয়ে কর্নেল বললেন : 'আমি এঁর সঙ্গে একটু ডুয়েল লড়বো বলে ঠিক করেছি।'

গার্ড বললে : 'বড়ো দুঃখিত হলুম। কিন্তু কী করবো বলুন। ঐ শুনুন গাড়ি ছাড়বার ঘণ্টা পড়লো।' সঙ্গে-সঙ্গে গাড়ি ছেড়ে দিলো। গার্ড সবিনয়ে বললে, 'আমায় মাপ করবেন আপনারা। অন্যদিন হ'লে আপনাদের জন্যে আমি একটু অপেক্ষা করতে পারতুম। তা আপনারা যদি একান্ত ডুয়েল লড়তে চান, চলতি ট্রেনেও তা হ'তে পারে।'

ফগকে বিদ্রূপ ক'রে কর্নেল বললেন : 'বোধহয় ওঁর তাতে সুবিধে হবে না।'

ফগ বললেন : 'আমার কোন অসুবিধে হবে না,—আপনার সুবিধে হ'লেই হ'লো।'

গার্ড তখন তাঁদের সঙ্গে নিয়ে ট্রেনের শেষ কামরায় গেলেন। কামরায় দশ-বারোজন মাত্র যাত্রী ছিলো। গার্ড তাদের বললে, 'এই দু-জন ভদ্রলোকের একটু হিশেব-নিকেশ আছে। আপনারা যদি এঁদের একটু জায়গা দিতে পারেন, তবে খুব ভালো হয়।'

তাঁদের অনুগৃহীত ক'রে যাত্রীরা পাশের কামরায় চ'লে গেলো।

কামরাটা পঞ্চান্ন ফুট লম্বা, সুতরাং বন্দুক ডুয়েলের পক্ষে কোনই অসুবিধে ছিলো না। ফিলিয়াস ফগ আর কর্নেল প্রক্টর কামরার মধ্যে ঢুকলেন রিভলভার হাতে। কামরার দরজা বন্ধ ক'রে আর-সবাই অন্যখানে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ঠিক হ'লো, ইঞ্জিনের সিটি শুনলেই লড়াই শুরু হবে এবং দু-মিনিট ধ'রে চলবে। এতো সহজে এতো তাড়াতাড়ি সব বন্দোবস্ত হ'য়ে গেলো যে ফিক্স আর পাসপার্তু হতভম্ব হ'য়ে গেলো।

ট্রেনের সিটির জন্যে উৎকণ্ঠীত হ'য়ে সবাই যখন অপেক্ষা করছে, তখন হঠাৎ ভয়ানক গণ্ডগোল শুরু হ'লো। সেই হৈ-চৈ-এর মধ্যে ট্রেনের নানান জায়গা থেকে গর্জে উঠলো একসঙ্গে অনেকগুলো বন্দুক। যাত্রীরা চেঁচিয়ে উঠলো। আর্তনাদে আর্তনাদে চারদিক মুখর হয়ে উঠলো। কর্নেল প্রক্টর আর ফিলিয়াস ফগ রিভলভার হাতে যেখানে গোলযোগ সবচেয়ে বেশি, সেদিক পানে ছুটলেন।

একদল সিয়োক্স দস্যু চলতি ট্রেন আক্রমণ করেছিলো। আমেরিকার সেই নির্জন অঞ্চলে প্রায়ই তারা এ-ভাবে লুঠতরাজ চালাতো। তলোয়ার-বন্দুক নিয়ে ক্ষিপ্রবেগে ট্রেনের পা-দানির উপর উঠতো লাফিয়ে, লুঠ করতো যাত্রীদের যথাসর্বস্ব।

দস্যুদের মধ্যে একজন ইঞ্জিনের উপর উঠে ড্রাইভার আর ফায়ারম্যানকে আহত করলো। তার ইচ্ছে ছিলো ট্রেন থামানোর, কিন্তু ইঞ্জিনের ব্যবহার না জানায় সে খুলে ফেললো বাষ্প-নলের মুখ। অমনি ট্রেন না থেমে উল্কার মতো ছুটতে লাগলো। অন্যান্য দস্যুদের সঙ্গে যাত্রীদের ভীষণ লড়াই শুরু হ'লো। রিভলভার আর বন্দুকের শব্দে কেঁপে উঠতে লাগলো চারদিক।

ট্রেন ছুটছিলো উল্কার মতো। গার্ড রিভলভার চালাতে-চালাতে ফগকে বললে: 'যদি ট্রেন না থামাতে পারেন, তাহ'লে একজনও বাঁচবে না। ফোর্ট কিয়ার্নি স্টেশন আর মাত্র পাঁচ-ছ মাইল দূরে। গাড়ি যদি স্টেশন পেরিয়ে চ'লে যায়, তাহ'লে দস্যুদের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর অন্য কোনো উপায় থাকবে না। উঃ! গার্ড আরো কি বলতে যাচ্ছিলো, এমন সময় দস্যুদের একটা গুলি এসে তার বুক ভেদ করলো। গার্ড ছিটকে পড়লো। ভলকে-ভলকে রক্ত উঠলো তার মুখ দিয়ে।

ফগ গার্ডের কথা শুনেই ট্রেন থামাবার জন্যে অগ্রসর হলেন। পাসপার্তু তাঁর পাশেই ছিলো। সে চেঁচিয়ে উঠলো, 'আপনি

যাবেন না—যাবেন না! এ একটা সামান্য কাজ—আমারই উপযুক্ত।' ফগ তাকে বারণ করবার আগেই সে জানলা দিয়ে কামরার বাইরে চ'লে গেলো, আর খুব সাবধানে ঝুলতে-ঝুলতে ট্রেনের সামনের দিকে এগিয়ে গেলো। লগেজ-গাড়ি ও ইঞ্জিনের মাঝখানের লোহার রডটা এক হাতে ধ'রে অন্য হাতে দু-গাড়ির সংযোজন-শৃঙ্খল খুলে দিলো। যে-লোহার রডটা দিয়ে ইঞ্জিনের সঙ্গে লগেজ-গাড়ি আটকানো ছিলো, তা তখন মুহূর্তের মধ্যে গেলো ভেঙে। খালি ইঞ্জিন বিদ্যুৎবেগে ছুটে চললো সামনের দিকে, আর প্রতি মুহূর্তেই কমতে লাগলো ট্রেনের গতি। দেখতে-দেখতে ট্রেনটা ফোর্ট কিয়ার্নি স্টেশনের কাছে এসে একেবারে থেমে গেলো। দস্যুদল তখন পালিয়ে যেতে বাধ্য হ'লো।

আরোহীদের মধ্যে যারা আহত হয়েছিলো, তাদের কারো আঘাতই তেমন সাংঘাতিক ছিলো না। মৃতের সংখ্যাও খুব বেশি ছিলো না। কর্নেল প্রক্টর একটু বেশি আহত হয়েছিলেন, অন্যান্য আহত যাত্রীদের সঙ্গে কর্নেলকেও ফার্স্ট-এডের জন্যে রেল স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হ'লো।

আউদা আর ফগ কিন্তু একেবারেই আহত হন নি। ফিক্সের কাঁধের খানিকটা মাংস ছ'ড়ে গিয়েছিলো মাত্র। কিন্তু পাসপার্তুকে পাওয়াই গেলো না—কেউ দিতে পারলো না তার সন্ধান। আউদা তার জন্যে কাঁদতে শুরু করলেন, আর ফগ অপলক চোখে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। আউদা সকাতর চোখে ফগের দিকে তাকালেন। সে-দৃষ্টির মানে বুঝতে বিন্দুতিল দেরি হ'লো না ফগের। কর্তব্য ঠিক ক'রে নিয়ে আউদার দিকে তাকিয়ে বললেন: 'জ্যান্ত কিংবা মরা,—আমি পাসপার্তুকে খুঁজে বার ক'রবোই।' আউদা সে কথা শুনে অবেগভরে ফগের সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করলেন।

ফিলিয়াস ফগ শপথ করলেন যে, যে-ক'রেই হোক পাসপার্তুর সন্ধান না ক'রে যাবেন না—সেজন্যে যদি সর্বস্ব যায়, তাতেও রাজি।

তাঁর একথা ভালো ক'রেই জানা ছিলো যে, পথে একদিন দেরি হ'লেই আর নিউ-ইয়র্কে গিয়ে জাহাজ পাবেন না—আর নিউ-ইয়র্কে জাহাজ ধরতে না-পারলে বাজিতে নিশ্চিতভাবেই তাঁকে হারতে হবে। কিন্তু পাসপার্তুতের অনুসন্ধান করাই কর্তব্যনিষ্ঠ ফগের কাছে বড়ো হ'য়ে দাঁড়ালো।

ফোর্ট কিয়ার্নি একটা ছোটো দুর্গ। দুর্গের সৈন্যরা বন্দুকের আওয়াজ ও তুমুল হৈ-চৈ শুনে আগেই রেল স্টেশনে এসেছিলো। তাদের কম্যাণ্ডারকে ফগ বললেন : 'দেখুন, তিনজন যাত্রীর কোনো খোঁজই পাওয়া যাচ্ছে না।'

'তারা ম'রে গেছে নাকি ?'

'মরুক আর দস্যুর হাতে বন্দীই হোক, তাদের খোঁজ করতেই হবে। আপনি কি সৈন্য নিয়ে দস্যুদের অনুসরণ করতে চান ?'

কম্যাণ্ডার বললেন : 'এ হ'লো সাংঘাতিক কথা! তারা যে পালাতে-পালাতে কোথায় যাবে তার কি কোনো ঠিক-ঠিকানা আছে ? আমি তো আর দুর্গ অরক্ষিত অবস্থায় রেখে যেতে পারিনে। কে জানে সুবিধে পেলে দস্যুরা এসে দুর্গ আক্রমণ করবে কি না। তিনজনের জন্যে তো আর পঞ্চাশ জনের জীবন বিপন্ন করতে পারিনে। দস্যুর আক্রমণে অনেকেরই তো প্রাণ গিয়েছে। কিন্তু তার আর কী করবেন বলুন।'

'পঞ্চাশ জনের জীবন বিপন্ন হবে কিনা জানিনে,—কিন্তু আমার মনে হয় আপনার করাই উচিত।'

কম্যাণ্ডার তীব্র কণ্ঠে বললেন : 'আমাকে আমার কর্তব্য বুঝিয়ে দিতে পারে এমন লোক তো এখানে দেখছিনে !'

শান্ত গলায় ফগ বললেন : 'বেশ। আমি তা'হলে একাই যাবো।'

ফিক্সের কাছে ফগের একা যাওয়ার কথা ভালো লাগলো না। এতোদূর অনুসরণ করে কি শেষটায় ব্যাংক-দস্যুকে হারাবেন ? তিনি বললেন : 'আপনি একাই দস্যুদের অনুসরণ করতে চান ? না, না—সে হবে না।'

'আপনি কি বলতে চান যার জন্যে আমরা প্রাণ পেয়েছি, সেই অকুতোভয় পাসপার্তুতকে দস্যুর কবলে ফেলেই আমি চ'লে যাবো? কখনো তা হবে না। আমি নিশ্চয়ই তার খোঁজ করতে যাবো!'

ফগের কথা শুনে কম্যাণ্ডার কি ভাবলেন, কে জানে। বললেন: 'আপনাকে আর একা যেতে হবে না,—আপনি দেখছি সত্যিকার বীর!' তারপর সৈন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন: 'আমি ত্রিশ-জন লোক চাই—কে-কে যাবে, এসো।'

ডাক শুনে সবাই যখন এগিয়ে এলো, তখন কম্যাণ্ডার ত্রিশ-জনকে বাছাই ক'রে নিয়ে যাত্রার জন্যে হুকুম দিলেন। এক ধীর-স্থির প্রবীণ অফিসার সেই দলের নেতৃত্ব নিলেন।

ফগ কম্যাণ্ডারকে অজস্র ধন্যবাদ জানিয়ে রওনা হচ্ছেন দেখে ফিক্স এগিয়ে এলেন। বললেন: 'আমাকে কি সঙ্গে নেয়া যায় না?'

'আপনার যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন। কিন্তু আপনি যদি মিসেস আউদার ভার নিতেন, তাহ'লেই আমার বেশি উপকার হ'তো। আমারও তো বিপদ ঘটতে পরে!'

ফিক্সের মুখ শুকিয়ে গেলো। এতো পরিশ্রম ক'রে বিপদ-আপদ তুচ্ছ ক'রে এতোদিন ধ'রে যার অনুসরণ ক'রে এলেন, আজ কিনা তাকে একা ছেড়ে দিতে হচ্ছে, চোখের আড়াল করতে হচ্ছে! তীব্র চোখে ফগের দিকে তাকালেন তিনি। দেখতে পেলেন, ফগের মুখে কুটিলতার কোনো চিহ্নই নেই। ফগের সরল দৃষ্টির কাছে হার মানলেন ফিক্স। গ্রহণ করলেন আউদার দেখাশোনার ভার।

ফিলিয়াস ফগ তাঁর ব্যাংক-নোট-বোঝাই ব্যাগটা আউদার হাতে দিয়ে এগোলেন। যাত্রার সময় সৈন্যদের বললেন: 'যদি আমরা বন্দীদের উদ্ধার করতে পারি, তাহ'লে আপনাদের এক-হাজার পাউণ্ড পুরস্কার দেবো ব'লে শপথ করছি।'

একটু বাদেই ফগ ফৌজ নিয়ে দৃষ্টির বাইরে চ'লে গেলেন। আউদা তখন ওয়েটিং রুমে ব'সে-ব'সে ভাবছিলেন মহৎ হৃদয় ফগের

কথা। আর ফিক্স বাইরে একটা চেয়ারে ব'সে ভাছিলেন, 'আমি কী গর্দভ! পকেটে ওয়ারেন্ট থাকতেও আমি কিনা দস্যুটাকে ছেড়ে দিলুম! আর কি ফিরে আসবে সে? বোধহয় না। সে আমাকে নিশ্চয়ই ফাঁকি দিয়েছে।' অমনি তাঁর মনে হ'লো, ফগকে এখনো অনুসরণ করা চলে বরফের উপর পায়ের ছাপ দেখে-দেখে। কিন্তু সে-আশায় যে ছাই, তা বুঝতে তার দেরি হ'লো না। যেতে-যেতেই আরো বরফ পড়বে, আর তাহ'লেই থাকবে না কোনো পদচিহ্ন। ফিক্স হতাশ হ'য়ে পড়লেন। তাঁর চোখে অন্ধকার ঘনিয়ে এলো।

সময় কারো জন্যে ব'সে থাকে না। বরফের কুচি আর কুয়াশার মধ্য দিয়েই এগিয়ে চললো সময়। দেখতে-দেখতে বাজলো তিনটে। এমন সময় হঠাৎ ট্রেনের সিটি শোনা গেলো। সঙ্গে-সঙ্গেই দেখা গেলো, একটি ট্রেনের ইঞ্জিন স্টেশনের কাছে এসে থেমেছে।

পাসপার্তু যে-ইঞ্জিনটা ট্রেন থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে দিয়েছিলো তা অনেক দূর অবধি বিদ্যুৎবেগে ছুটে গিয়েছিলো। কিন্তু ক্রমে কয়লা ফুরিয়ে যেতেই অনেক দূর গিয়ে ধীরে-ধীরে থেমে পড়লো। আহত ড্রাইভারের ইতিমধ্যেই জ্ঞান ফিরে এসেছিলো। সে তক্ষুনি সকল অবস্থা বুঝতে পারলো। আবার আগুন জ্বেলে বিচ্ছিন্ন ট্রেনের খোঁজে সে ফের ফিরে আসতে লাগলো। কুয়াশায় কয়েক হাত দূরের জিনিশই দেখা যাচ্ছিলো না। ফোর্ট কিয়ার্নি স্টেশন যাতে পেরিয়ে চ'লে না-যায়, সেজন্যে ড্রাইভার বার-বার সিটি দিচ্ছিলো।

ইঞ্জিন আসতেই যাত্রীরা আনন্দিত হ'য়ে উঠলো। বিচ্ছিন্ন ট্রেন আবার ইঞ্জিনের সঙ্গে যুক্ত করা হ'লে আউদা নতুন গার্ডকে শুধোলেন, 'গাড়ি কখন ছাড়বে?'

'এক্ষুনি।'

'কিন্তু বন্দীরা? আর যাঁরা তাদের খোঁজে গেছেন—'

'তা ব'লে তো আমি ব'সে থাকতে পারি নে! গাড়ি তিন ঘণ্টা পিছিয়ে পড়েছে।'

সানফ্রান্সিসকো থেকে আবার কখন গাড়ি আসবে?'

'কাল সন্ধের সময়।'

'তাহ'লে তো খুব দেরি হ'য়ে যাবে। আপনি কি অপেক্ষা করতে পারবেন না?'

'অসম্ভব। যদি যেতে হয় তবে আসুন, আর দেরি করবেন না।'

'তাঁদের ফেলে আমি যাবো না।'

আহত যাত্রীরা সকলেই গাড়িতে উঠে বসলো। ট্রেন ছেড়ে দিলো।

ফিক্স হতাশ হ'য়ে পড়েছিলেন খুব। ট্রেন পেলেই চ'লে যাবেন ব'লে ঠিক করেছিলেন, কিন্তু সত্যি-সত্যিই যখন ট্রেন পাওয়া গেলো তখন আর তিনি গেলেন না। ভাবলেন 'দেখা যাক, শেষ অবধি কী হয়। আবার তো ট্রেন পাওয়া যাবে।'

বরফ যেমন পড়ছিলো তেমনি পড়তে লাগলো। কুয়াশা উঠলো আরো ঘন হ'য়ে। আগের মতোই বইতে লাগলো ঠাণ্ডা হাওয়া। ক্রমে সন্ধ্যা হ'লো। রাত্রির অন্ধকারে স্টেশনটা ভূতের মতো নিঝুম হ'য়ে প'ড়ে রইলো। আশংকায়, উৎকণ্ঠায় রাত্রে ঘুম হ'লো না আউদার। কিন্তু ফগদের কোনো খোঁজই পাওয়া গেলো না। ভোরবেলা আবহাওয়া অনেকটা ভালো হ'লো বটে, কিন্তু ফগের কোন খবর পাওয়া গেলো না। আউদা আর ফিক্স উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়লেন। সৈন্যদের জন্যে চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন কম্যাণ্ডার।

ক্রমে বেলা বেড়ে চললো। চিন্তিত কম্যাণ্ডার তাদের খোঁজে দুর্গের বাকি সৈন্যদের পাঠাবেন ব'লে ঠিক করলেন। সৈন্যরা তৈরি হ'লো। এমন সময় হঠাৎ দূরে বন্দুকের আওয়াজ হ'লো। খানিকক্ষণের মধ্যে ফিলিয়াস ফগ, জঁ৷ পাসপার্তু ও আর সবাই স্টেশনে এসে হাজির হ'লো।

ফোর্ট কিয়ার্নি থেকে মাইল-দশেক দূরে দস্যুদের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়েছিলো। তাঁরা দূর হ'তে পাসপার্তু আর অন্য দুজন যাত্রী

দস্যুদের সঙ্গে লড়াই করছে দেখতে পেয়েছিলেন। এমন সময় ফগ ফৌজ নিয়ে সেখানে হাজির হ'য়ে সবাইকে উদ্ধার করলেন।

পাসপার্তু স্টেশনে এসেই ফিক্সকে দেখে শুধোলো: 'ট্রেন কই?' তার ভরশা ছিলো, তাদের এই বিপদের মধ্যে রেখে ট্রেন কখনোই চ'লে যাবে না।

ফিক্স ভারি গলায় বললেন: 'ট্রেন নেই, চ'লে গেছে।'

ফগ শান্ত কণ্ঠে শুধোলেন: 'আবার কখন গাড়ি পাওয়া যাবে?'

'সন্ধ্যার আগে না।'

একথা শুনে ফিলিয়াস ফগ শুধু বললেন: 'তাই তো!'

* এগারো *

।। কখনো হতাশ হতে নেই ।।

ফিলিয়াস ফগের কুড়ি ঘণ্টা দেরি হ'য়ে গেলো। পাসপার্তু খুব দুঃখিত হ'য়ে পড়লো। ভাবতে লাগলো, 'আমার জন্যেই সর্বনাশ ঘটলো ফিলিয়াস ফগের।'

ফিক্স ফগকে বললেন: 'সত্যিই কি আপনার তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার? বিলেতের ডাক-জাহাজ ধ'রতে চান বুঝি? তাহ'লে এগারো তারিখের আগেই আপনার নিউ-ইয়র্কে পৌঁছনো দরকার।'

'হ্যাঁ। ডাক-জাহাজের উপরই আমার সর্বস্ব নির্ভর করছে।'

'যদি এসব বাধা-বিপত্তি না-ঘটতো তাহ'লে তো এগারো তারিখ ভোরেই নিউ-ইয়র্ক যেতে পারতেন।'

'হ্যাঁ, তাহ'লে আমার হাতেই বরং আরো বারো ঘণ্টা সময় বেশি থাকতো।'

'আপনার তো মোট কুড়ি ঘণ্টা দেরি হয়েছে,—তার থেকে বারো ঘণ্টা বাদ দিলে থাকে আট ঘণ্টা। এই আট ঘণ্টার বিলম্বে

যাতে আপনার কোনো ক্ষতি না হয়, তা কি আপনি করতে রাজি আছেন?'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু কী ক'রে সে আট ঘণ্টা পুষিয়ে নেবো?'

'বরফ যখন পড়েছে, তখন স্লেজ গাড়ি বেশ চলবে। হাওয়াও আছে, পাল তুলে দিলে রেলের মতো যাবে। একটা লোক তার স্লেজ ভাড়া দিতে পারে বলছিলো।'

স্টেশনের কাছেই স্লেজ-ওলার বাড়ি। ফগ স্লেজ দেখে তো খুব খুশি হ'য়ে পড়লেন। গাড়িটা বেশ ভালোই, পাঁচ-ছজন লোক ধরবে অনায়াসে। গাড়ির ঠিক মাঝখান থেকে একটা মাস্তুল উঠেছে উপরে, আর তাতে ঝুলছে বড় একটা পাল। হালও ছিলো গাড়ির। স্লেজ-ওলা বললে: 'পশ্চিম থেকে হাওয়া বেশ জোরে বইছে, বরফও খুব শক্ত হ'য়ে গিয়েছে জ'মে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা ওমাহা স্টেশনে যেতে পারবো। ওমাহায় নিউ-ইয়র্ক আর শিকাগোর বহু ট্রেন পাওয়া যায়।'

তখন বেলা আটটা। ফগ তখুনি যাত্রার ব্যবস্থা করলেন। সবাই স্লেজে উঠে বসলেন। স্লেজ-ওলা পাল তুলে দিলো। প্রবল হাওয়ায় ফুলে উঠলো পাল। দুলতে লাগলো স্লেজ। তক্ষুনি সেই মসৃণ অথচ কঠিন বরফের উপর দিয়ে তীরবেগে ছুটলো স্লেজ। হিশেব করে দেখা গেলো, স্লেজ যাচ্ছে ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে। ফোর্ট কিয়ার্নি থেকে ওমাহা স্টেশন দুশো মাইল। এভাবে স্লেজ চলতে থাকলে বেলা একটার মধ্যেই ওমাহা পৌঁছোনোর কথা। শীতে গায়ের রক্ত পর্যন্ত জমে যাবার জোগাড় হয়েছিলো। সবাই নির্বাক হ'য়ে রইলেন। দিগন্তবিহীন বরফের উপর দিয়ে ছুটে চললো স্লেজ। সুদক্ষ স্লেজ-ওলা দৃঢ় হাতে হাল ধ'রে সোজা নাক-বরাবর চালিয়ে দিলো স্লেজ। স্লেজ যেন উড়ে চলতে লাগলো।

বেলা বারোটার সময় স্লেজ-ওলা পাল নামিয়ে দিয়ে বললো: 'ঐ যে ওমাহা দেখা যায়।'

ফগ তাকিয়ে দেখলেন, দূরে কতোগুলো বরফ-ছাওয়া ঘরদোর দেখা যাচ্ছে। স্লেজ সেখানে গিয়ে থামতেই তাঁরা দ্রুতপদে নেমে শিকাগোর একটা ট্রেনে উঠে বসলেন। আর পাঁচ মিনিট দেরি হ'লেই ট্রেনটা ধরা যেত না।

পরদিন দশই ডিসেম্বর বিকেল চারটের সময় শিকাগোতে পৌঁছেই তাঁরা দেখলেন, এক্ষুনি নিউ-ইয়র্কগামী একটা ট্রেন ছাড়ছে। ফগ তাঁর দলবল নিয়ে ট্রেনে উঠতেই ট্রেন ছেড়ে দিলো। পরদিন বেলা এগারোটার সময় ট্রেন নিউ-ইয়র্কের জাহাজ-ঘাটে থামলো। ট্রেন থেকে নেমে তাঁরা পঁছলেন, লিভারপুলের জাহাজ 'চায়না' পঁয়-তাল্লিশ মিনিট আগে বন্দর ছেড়েছে। পাসপার্তু কাতরকণ্ঠে ব'লে উঠলো : 'হায়, হায় !' চায়নার সঙ্গে সঙ্গে ফগের সকল আশাই ভেসে গেলো। লিভারপুলে যাওয়ার তখন আর কোনো জাহাজ ছিলো না।

পাসপার্তু পাগলের মতো হয়ে উঠলো। আউদা তো একেবারে ভেঙে পড়লেন। মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিটের জন্যেই শেষে সব গেলো ! এতো পরিশ্রম এতো টাকা খরচ সব গেলো বৃথা ! পাসপার্তু নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলো। সে জানতো যে, তার জন্যেই এ বিভ্রাট ঘটলো। ফগ কিন্তু তাকে তিরস্কার করলেন না। সর্বনাশ হ'য়ে গেলো দেখেও বিন্দুতিল বিচলিত হ'লেন না। সোজা নিকোলাস হোটেলে এসে আশ্রয় নিলেন। আউদাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে একবার শুধু বললেনঃ কখনো হতাশ হ'তে নেই।'

সে রাত্রে উৎকণ্ঠায় অন্য কারো ঘুম না এলেও ফগের ঘুমের কোনো ব্যাঘাত ঘটলো না।

পরদিন বারোই ডিসেম্বর। ফগের হাতে তখন মোটে সময় ছিলো ন দিন তেরো ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট। যদি 'চায়না' জাহাজ ধরা যেতো, তাহ'লে ঠিক সময়ের মধ্যেই লণ্ডন পৌঁছে বাজি জিততে পারতেন ফগ। পাসপার্তু এইসব কথা ভেবে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে লাগলো।

ফগ সঙ্গীদের বললেন : 'যতোক্ষণ-না আসি, আপনারা এখানেই থাকবেন। ডাকামাত্রই যাতে রওনা হ'তে পারেন বন্দোবস্ত করবেন। যতোক্ষণ শ্বাস, ততোক্ষণ আশ। যাবার কোনো উপায় হয় কি না আমি একবার দেখে আসি।'

ফগ হাডসন নদীর তীরে এসে হাজির হলেন। দেখলেন, অনেক জাহাজই বন্দর ছাড়বার উদ্যোগ করছে, কিন্তু সেগুলো সবই পালের জাহাজ, কলের নয়। সুতরাং তাঁর সুবিধে হ'লো না। ইতস্তত ঘুরতে-ঘুরতে এস. এস. হেনরিয়েটা নামে একটা ছোটো জাহাজ তাঁর নজরে পড়লো। ফগ একটা নৌকো ক'রে জাহাজে গিয়ে উঠলেন। ক্যাপ্টেন জাহাজেই ছিলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রে ফগ বললেন : 'আমার নাম ফিলিয়াস ফগ, বাড়ি লণ্ডনে। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'আমি ক্যাপ্টেন। নাম আন্দ্রু সিপার্দি, বাড়ি কার্দিকে।'

'আপনি বুঝি এখনি জাহাজ ছাড়ছেন?'

'এক ঘণ্টার মধ্যেই ছাড়বো। বোর্দো যাচ্ছি।'

'কী বোঝাই নিয়েছেন?'

'কিছু না। জাহাজ খালি। না, কোনো যাত্রী নেই জাহাজে। আমি যাত্রী নিই নে, বড্ডো বিরক্ত করে তারা।'

'আপনার জাহাজ কি তাড়াতাড়ি চলতে পারে?'

'ঘণ্টায় তেরো-চোদ্দো মাইল যায়। হেনরিয়েটা জাহাজের নাম এ-এলাকায় সবাই জানে।'

'আপনি কি অনুগ্রহ ক'রে আমাকে আর আমার তিন বন্ধুকে লিভারপুল নিয়ে যেতে পারেন?'

বিদ্রূপের সুরে ক্যাপ্টেন বললেন : 'লিভারপুল! বলুন না কেন একদম চীন দেশেই নিয়ে যাই! ও-সব আমার দ্বারা হবে-টবে না। আমি বোর্দো যাবো ঠিক করেছি, সেখানেই যাবো।'

'যদি অনেক টাকা দিই?'

'টাকায় কী হবে? এ-জাহাজ আমার। আমাকে টাকার লোভ দেখাবেন না।'

'আমি যদি জাহাজ ভাড়া চাই?'

'ভাড়া? আমি ভাড়া দিইনে।'

'ভাড়া না-দিলে বিক্রি করুন।'

'তাও না।'

অবিচলিত-চিত্ত ক্যাপ্টেনের কথা শুনেও হতাশ হলেন না ফগ। যে ক'রেই হোক, অতলান্তিক মহাসাগর পেরিয়ে লিভারপুল যেতেই হবে। মনে-মনে একটা মতলব স্থির করে ক্যাপ্টেনকে আবার বললেন: 'ক্যাপ্টেন, আপনি কি আমাকে বোর্দোঁ নিয়ে যাবেন?'

'হাজার টাকা দিলেও যাত্রী নেবো না আমি।'

'আমি যদি পাঁচশো পাউণ্ড দিই?'

'প্রত্যেক যাত্রীর জন্যে।'

'হ্যাঁ, প্রত্যেকের জন্যে।'

'আপনারা তো চারজন আছেন, না? ক্যাপ্টেন সিপার্দি মাথা চুলকোতে লাগলেন'। একসঙ্গে দু-হাজার পাউণ্ড লাভ, অথচ তার জন্যে এক পয়সাও খরচ নেই। ক্যাপ্টেন বললেন: 'আমি ঠিক ন-টায় ছাড়বো। সময়-মতো হাজির হতে পারলে জাহাজে জায়গা হবে।'

ন-টার আগেই সবাই জাহাজে এসে উঠলেন। ন-টার সময় জাহাজ বোর্দোঁ যাত্রা করলো। আর ফিক্স অবাক হ'য়ে ভাবতে লাগলেন, 'একি! যাবো ইংল্যাণ্ডে, আর কোথায় চলেছি! কোথায় বোর্দোঁ আর কোথায় লিভারপুল! এর মানে তো কিছুই বুঝতে পারছি নে!'

হেনরিয়েটা জাহাজের নাবিকদের সঙ্গে ক্যাপ্টেনের যে বিশেষ সদ্ভাব ছিলো না, জাহাজে উঠেই ফগ তা বুঝতে পারলেন। প্রচুর টাকা দিয়ে একদিনের মধ্যেই নাবিকদের হাতে আনতে তাই ফগকে কোনো বেগ পেতে হ'লো না। যে-করেই হোক, হেনরিয়েটা যাতে লিভারপুল যায়, সে-ব্যবস্থা করতেই হবে। নাবিকদের সাহায্যে ফগ

ক্যাপ্টেন সিপার্দিকে তাঁর কেবিনে বন্দী ক'রে রাখলেন, আর নিজেই ক্যাপ্টেন হ'য়ে লিভারপুলের দিকে জাহাজ চালাতে লাগলেন।

ব্যাপার দেখে ফিক্সের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো। মনে-মনে আপশোশ করতে লাগলো, 'কেন মরতে এলুম এই দস্যুর সঙ্গে! ফিলিয়াস ফগ কক্ষনো লিভারপুল যাচ্ছে না! নিশ্চয়ই ও একজন বোম্বেটে, চলেছে নিজের গুপ্ত আড্ডায়! সেখানে না-জানি কী আমার বরাতে আছে!'

ফগ যেভাবে জাহাজ চালাতে লাগলেন, তাতে ম'নে হ'লো এ-কাজে তিনি খুব দক্ষ। পাসপার্তু তো রীতিমতো অবাক হ'য়ে গেলো। নাবিকেরা নতুন ক্যাপ্টেনের সদ্ব্যবহারে আর টাকায় এতো খুশি হয়েছিলো যে প্রাণপণে কাজ করতে লাগলো। হেনরিয়েটা পূর্ণ গতিতে এগিয়ে চললো লিভারপুল অভিমুখে।

আজ ষোলোই ডিসেম্বর। পঁচাত্তর দিন কেটে গেছে। এখনো অতলান্তিক মহাসাগরের পথে অনেকদূর যেতে হবে। দুর্ভাগ্য ছিলো ফগের সঙ্গে-সঙ্গেই। হেনরিয়েটার ইঞ্জিন-ম্যান দুঃসংবাদ জানালো: 'জাহাজের কয়লা ফুরিয়ে এসেছে। যেদিন থেকে জাহাজ ছেড়েছি, সেদিন থেকেই সমানে আগুন রেখেছি। লিভারপুল যাওয়ার মতো অতো কয়লা জাহাজে ছিলো না। বোর্দো যাওয়ার মতোই কয়লা নিয়েছিলুম আমরা।'

ফগ নিশ্চিন্তভাবে হুকুম দিলেন: 'আচ্ছা, যাও। যতোক্ষণ কয়লা আছে, পুরোদমে চালিয়ে যাও তো। আমি এই ফাঁকে ভেবে দেখি, কী করা যায়।'

আঠারো তারিখে যখন ইঞ্জিন-ম্যান এসে চরম খবর দিয়ে গেলো —আর একটুও কয়লা নেই, অবিচলিত ফগ তখন পাসপার্তুকে বললেন: 'ক্যাপ্টেন সিপার্দিকে এখানে নিয়ে এসো।'

ক্যাপ্টেন সিপার্দিকে দেখে মনে হ'লো যেন একটা ভীষণ বোমা ফেটে পড়বার অপেক্ষা করছে। কাছে এসেই ক্যাপ্টেন গম্ভীরস্বরে

ফগকে শুধোলেন : 'আমরা এখন কোথায় আছি ?'

'লিভারপুল থেকে সাতশো সত্তর মাইল দূরে।'

জবাব শুনেই ক্যাপ্টেনের পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত জ্ব'লে উঠলো। গর্জন ক'রে বললেন, 'তবে রে বোম্বেটে !'

সে-কথায় কান না-দিয়ে শান্ত গলায় ফগ বললেন : 'আপনার জাহাজ আমার কাছে বিক্রি করুন।'

'কক্ষনো না !'

'যদি বিক্রি না-করেন, তবে বাধ্য হ'য়েই জাহাজটা পুড়িয়ে ফেলতে হবে আমায়।'

'কী ! আমার জাহাজ পোড়াবেন !'

'নিশ্চয়ই। অন্তত উপরকার যা-কিছু কাঠের জিনিশ আছে, সবই পোড়াতে হবে। জাহাজের কয়লা ফুরিয়েছে। কিন্তু আমাকে তো যেতে হবে !'

চেঁচিয়ে উঠলেন ক্যাপ্টেন সিপার্দি : আপনার যাওয়া চাই ব'লে আমার জাহাজ পোড়াবেন ? জাহাজের দাম কতো জানেন ? নগদ পাঁচ হাজার পাউণ্ড !'

'এই নিন, আমি ছ-হাজার দিচ্ছি।' ফগ তক্ষুনি একতাড়া ব্যাংক-নোট ক্রুদ্ধ ক্যাপ্টেনের পকেটের মধ্যে ফেলে দিলেন।

নগদ ছ-হাজার পাউণ্ড ! মুহূর্তে সব রাগ জল হ'য়ে গেলো ক্যাপ্টেনের। পুরোনো একটা জাহাজের বদলে এতোগুলো টাকা পেয়ে রাজি হ'লেন সিপার্দি। বললেন : 'জাহাজের খোল আর ইঞ্জিন তো আমার ?'

'বেশ। খোল আর ইঞ্জিন আপনার। রাজি তো ?'

'নিশ্চয়ই।' টাকা গুনতে-গুনতে ক্যাপ্টেন বললেন : 'জাহাজের যতো কাঠ আছে সবই আপনার।'

খামাকা-খামাকা এতোগুলো টাকা উড়ে গেলো দেখে পাস-পার্তু আর ফিক্স তো হতভম্ব ! তাও জাহাজের খোল আর ইঞ্জিন

ক্যাপ্টেনেরই রইলো!

কিন্তু তখন ভাববার সময় নেই, হতভম্ব হবারও নয়। পাসপার্তু একাই বিপুল উৎসাহে কাঠ কাটতে লাগলো। কয়লার বদলে জাহাজের শুকনো কাঠগুলো ব্যবহৃত হ'তে লাগলো। সেইদিনই জাহাজের কেবিনগুলো, ডেকের একাংশ প্রভৃতি পুড়ে ছাই হ'য়ে গেলো।

পরদিন উনিশে ডিসেম্বর জাহাজের মাস্তুল আর বড়ো কাঠগুলো পোড়ানো হ'লো। প্রাণপণে জাহাজ চালাতে লাগলো নাবিকেরা।

পরদিন হেনরিয়েটার সব কাঠই গেলো ফুরিয়ে, শুধু খোলটা রইলো বাকি। আর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে লিভারপুলে যাওয়া চাই। নাবিকেরা যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলো।

দূরে কুইন্স-টাউনের আলো দেখে বললো ক্যাপ্টেন: 'আর কোনো আশা নেই মিস্টার ফগ! এই সবে আমরা কুইন্স-টাউন ছাড়ছি। এখনো অনেক দূর যেতে হবে। আপনার বরাত খারাপ—আমি কী করবো বলুন?'

ফগ বললেন: 'ঐ যে আলো দেখা যাচ্ছে, সে কি কুইন্স-টাউনের? আমরা কতোক্ষণে বন্দরে পৌঁছুতে পারবো?'

'তিনটের আগে না। জোয়ার চাই তো!'

অবিচলিত স্বরে ফগ বললেন: 'তবে এখন জোয়ারের জন্যেই অপেক্ষা করা যাক। যতোক্ষণ শ্বাস, ততোক্ষণ আশ। হতাশা মানেই তো মৃত্যু।'

বারো ॥ ভাগ্য যখন বিরূপ ॥

আমেরিকার ডাক কুইন্স-টাউনে নামতো একটি দ্রুতগামী ট্রেনে। সেই ডাক পাঠানো হ'তো ডাবলিনে। ডাবলিনে ডাক নেয়ার জন্যে লিভারপুলগামী স্টীমার প্রস্তুতই থাকতো। ফগ হিশেব ক'রে

দেখলেন, সেই পথে গেলে নির্দিষ্ট সময়ের বারো ঘণ্টা আগেই লিভারপুল পৌঁছনো যাবে,—আর অনায়াসেই আটটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে পৌঁছনো যাবে লণ্ডন।

রাত একটার সময় হেনরিয়েটা কুইন্স-টাউনে নোঙর করলো। তিলমাত্র দেরি না-ক'রে ফগ ট্রেনে উঠলেন, আর পরদিন বেলা এগারোটা চল্লিশ মিনিটের সময় পৌঁছলেন লিভারপুল।

লণ্ডন সেখান থেকে ছ-ঘণ্টার পথ। ট্রেনেরও অভাব ছিলো না। ফগ বুঝলেন, বিজয় সুনিশ্চিত। পাসপার্তু তো আনন্দে নেচেই উঠলো। ঠিক সেই সময় ফিক্স ফগের কাঁধে হাত দিয়ে বললেন: 'মিস্টার ফিলিয়াস ফগ, চুরির অপরাধে রাজার নামে আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করলুম।'

ফিলিয়াস ফগ বন্দী হলেন। আকাশ ভেঙে পড়লো তাঁর মাথায়। ফিক্স তাঁকে কাস্টম-হাউসেরই একটা ঘরে বন্দী ক'রে রাখলেন।

পুলিশ বাধা না-দিলে পাসপার্তু নিশ্চয়ই ফিক্সকে তখন ছিঁড়ে ফেলতো। মন তার ক্ষোভে দুঃখে ভেঙে পড়লো। ঈশ! আগেই যদি সে ফগকে ফিক্সের পরিচয় দিতো, তাহ'লে তো এমনটা ঘটতো না! আর আউদাকে দেখে মনে হ'লো, তিনি যেন এইমাত্র চিতা থেকে উঠে এলেন।

যখন বাজি জিতে গৌরবের স্বর্ণমুকুট পরবেন মাথায়, ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘটলো সর্বনাশ। পথের ভিখিরি হ'য়ে পড়লেন ফগ। তখনো পৌনে ন-ঘণ্টা সময় ছিলো। লণ্ডন পৌঁছতে ছ-ঘণ্টার বেশি লাগতো না। ভাগ্য বিরূপ ব'লেই বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হ'লো।

ফগ নির্বাক হ'য়ে বন্ধ ঘরে ব'সে রইলেন। তাঁর মনে তখন যে ঝড় চলছিলো, তার কোনো চিহ্নই তার ভাবলেশহীন মুখে দেখা গেলো না। সকলেই দেখলো, ফগ তাঁর ঘড়িটা সামনের টেবলের উপর রেখে অপলক চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছেন, যেন একমনে সেকেণ্ড, মিনিট প্রভৃতি গুনছেন। উজ্জ্বল চোখের তারার একটা

অস্বাভাবিক আলো ছাড়া এই ভীষণ দুর্ঘটনাতেও তাঁর কোনো পরিবর্তন হয়েছে ব'লে মনে হ'লো না।

অস্থির পদক্ষেপে সারা ঘরে পায়চারি করতে লাগলেন ফগ। ঘুরতে-ঘুরতে ক্লান্ত হ'য়ে আবার বসলেন চেয়ারে। পকেট থেকে ডায়েরিটা বের ক'রে পড়লেন: 'একুশে ডিসেম্বর, শনিবার—লিভারপুল।' তার নিচে ফগ লিখলেন: 'আশি দিনের দিন, বেলা এগারোটা চল্লিশ মিনিট।'

নির্বাক হ'য়ে ফিলিয়াস ফগ ব'সে রইলেন। কাস্টম-হাউসের ঘড়িতে ঢং ক'রে বেলা একটা বাজলো। ফগ দেখলেন, তাঁর নিজের ঘড়ি দু-মিনিট ফাস্ট।

ক্রমে বাজলো দুটো। তখনো মুক্তি পেলে একটি দ্রুতগামী এক্সপ্রেস ট্রেন ধরতে পারতেন ফগ—তাহ'লেও জয় হ'তো তাঁর।

পনেরো মিনিট গেলো, কুড়ি মিনিট গেলো, কাটলো আধঘণ্টা। আর কোনো আশা নেই!

হঠাৎ সশব্দে বন্ধ ঘরের দরজা খুলে গেলো। আউদা ফিক্স আর পাসপার্তুকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। ব্যগ্রকণ্ঠে ফিক্স বললেন: 'মিস্টার ফগ, ক্ষমা করুন, ক্ষমা করুন! ভুল ক'রে ধরা হয়েছিলো আপনাকে। আসল চোর ধরা পড়েছে। আপনার চেহারার সঙ্গে তার চেহারার মিল ছিলো ব'লেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। আপনি মুক্ত।'

ফিলিয়াস ফগ মুক্ত হলেন। ধীর পায়ে ফিক্সের দিকে এগিয়ে গেলেন। এক মুহূর্তের জন্যে তাকালেন তাঁর মুখের দিকে। পর-মুহূর্তেই তাঁর একটা ঘুসিতে ফিক্স প'ড়ে গেলেন ঘরের মেঝেয়। এক-টাও কথা না-ব'লে ফগ সঙ্গীদের নিয়ে একটা ট্যাক্সিতে উঠলেন।

ফগের দুর্ভাগ্য—রেল-স্টেশনে পৌঁছেই শুনলেন, লণ্ডনের ট্রেন দুটো পাঁচ মিনিটের সময় চ'লে গেছে।

শিগগির কোনো ট্রেন নেই দেখে তক্ষুনি একটা স্পেশ্যাল ট্রেনের বন্দোবস্ত করলেন। ট্রেন প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ালো।

ড্রাইভারকে পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে গাড়িতে উঠলেন ফগ। চেষ্টার ত্রুটি করলো না ড্রাইভার। কিন্তু ট্রেন যখন লণ্ডনে এসে পৌঁছলো তখন স্টেশনের ঘড়িতে আটটা পঞ্চাশ বেজে গেছে।

সারা পৃথিবী ঘুরে ফিরতে ফিলিয়াস ফগের শেষ পর্যন্ত পাঁচ মিনিট দেরি হ'য়ে গেলো।

হার হ'লো ফিলিয়াস ফগের।

তেরো ।। আউদার কথা

লণ্ডনে পৌঁছেই ফিলিয়াস ফগ সোজা বাড়ি চ'লে এলেন, ক্লাবে আর গেলেন না। এমনিতরো এক ভ্রমণে অপরের দোষে হেরে যাওয়া যে কী মর্মান্তিক তা অন্যে বুঝতে পারবে না। কিন্তু মিস্টার ফগ তখনো অবিচলিত। তাঁর বাড়ির যথাসর্বস্ব তখন বারিং-এর গদিতে ছিলো—সে-টাকা এখন রিফর্ম ক্লাবের সভ্যদের। খরচপত্র বাদে তাঁর হাতে যা-কিছু সামান্য টাকাকড়ি ছিলো, তা নিয়েই কোনো রকমে এবার দিন কাটাতে হবে।

ফগ তাঁর বাড়ির একটা কোঠা আউদার জন্যে ছেড়ে দিলেন।

পাসপার্তু শুনেছিলো, অনেক সময় এ-রকম দুর্দশায় পড়লে হতাশ-হৃদয় মানুষ আত্মহত্যা ক'রে সকল যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করে। ফগ যাতে তেমন কিছু ক'রে না-বসেন সেজন্যে সে সতর্ক রইলো। বলা বাহুল্য, বাড়ি পৌঁছেই পাসপার্তু তার কোঠার গ্যাসের বাতি নিভিয়ে দিয়েছিলো।

ক্রমে রাত এলো। রাত ঘনও হ'লো। সকলেই শুলেন। ফগ ঘুমিয়েছিলেন কি না কে জানে। আউদা সারা রাত দুশ্চিন্তায় কেঁদে কাটিয়েছিলেন। আর পাসপার্তু সারা রাত অতন্দ্র চোখে ব'সে ছিলো ফগের ঘরের দরজায়।

পরদিন ভোরবেলা পাসপার্তুকে ডাকলেন ফগ। বললেন : 'মিসেস আউদার প্রাতরাশের বন্দোবস্ত করো। আর ব'লে এসো আজ সন্ধ্যায় আমি তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে চাই।'

ফগ সেদিন আর রিফর্ম ক্লাবে গেলেন না। কী-ই বা দরকার যাওয়ার? সারাদিন বন্ধ ঘরে ব'সে আপনার ভবিষ্যৎ ঠিক করছিলেন ফগ। পাসপার্তুত মুহূর্তের জন্যেও সেই বন্ধ দরজা ত্যাগ করলো না। ঘরের মধ্যে সামান্য একটু শব্দ হতেই উৎকর্ণ হচ্ছিলো সে—এই বুঝি ঘটলো কোনো দুর্ঘটনা। দরজার চাবির ফাঁক দিয়ে সে মধ্যে-মধ্যে ঘরের ভিতর দৃষ্টিক্ষেপ ক'রে ফগকে দেখে নিচ্ছিলো।

ক্রমে সন্ধ্যা হ'লো। সাড়ে সাতটার সময় ফগ আউদার ঘরে এসে চুল্লির পাশে একটা চেয়ারে বসলেন। তাঁর ভাবলেনহীন মুখ দেখে কে বলবে যে তিনি এমনিতরো একটি বাজিতে হেরেছেন! একটু চুপ ক'রে থেকে আউদাকে বললেন : 'আপনাকে ইংল্যাণ্ডে এনে বড়ো অপরাধ করেছি। সেজন্যে ক্ষমা চাইছি!'

চঞ্চল হ'য়ে উঠলো আউদার হৃদয়। তাঁকে যিনি মৃত্যুর হাত থেকে ছিনিয়ে এনে বাঁচালেন, তিনি চাইছেন ক্ষমা? তাঁর চোখে জল ভ'রে এলো।

ফগ ব'লে চললেন : 'যখন আপনাকে এখানে আসতে বলি, তখন আমার টাকার অভাব ছিলো না। ভেবেছিলুম সেই টাকার অর্ধেক আপনার জন্যে খরচ করবো। আপনি তাহ'লে স্বাধীনভাবে থাকতে পারতেন। আপনি তো জানেন, এখন আমি পথের ভিখিরি।'

ভাঙা গলায় আউদা বললেন : 'মিস্টার ফগ, আমি সবই জানি। আপনার সঙ্গে-সঙ্গে একটা ভারি বোঝার মতো আমার আসাটাই অন্যায় হয়েছে। আমিই সেজন্যে ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে। আমিই তো ছিলুম আপনার ক্ষিপ্রগতির প্রধান বাধা। পথে আপনার কতো দেরিই না হ'লো আমার জন্যে। সে না-হ'লে কি আজ এমন দুর্দশা হয় আপনার! আমি পুড়ে মরছিলুম সেই ছিলো ভালো।'

'আপনার জন্যে আমার একতিলও দেরি হয়নি। সেজন্যে আপনি দুঃখিত হবেন না। আপনি ভারতবর্ষে নির্বিঘ্নে থাকতে পারতেন না। একদিন যারা আপনাকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিলো, তারাই আবার আপনাকে খুঁজে বার ক'রতো।'

'আপনি মহৎ হৃদয়, তাই সেই বিপদ থেকে আমাকে তো উদ্ধার করেইছিলেন, এখানে এসে যাতে আমি স্বাধীনভাবে সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাতে পারি তার ব্যবস্থাও করতে চেয়েছিলেন।'

'চেয়েছিলুম, কিন্তু হ'লো কই? আমার দুর্ভাগ্য সব ওলোট-পালোট ক'রে দিলে! যাই হোক, আমার এখনো যা-কিছু আছে তাই আমি আপনার হাতে দিতে চাই।'

'তাহ'লে আপনার কী করে চলবে? আপনি বোধহয় আপনার ভবিষ্যতের দিকে তাকাচ্ছেন না। আপনার যাতে কোনো অসুবিধে না হয়, আপনার বন্ধুরা তো সেদিকে নজর রাখবেন নিশ্চয়ই?'

'আমার কোনো অভাব নেই ব'লেই সকল অবস্থাই আমার কাছে সমান, ভবিষ্যৎও। আমার কোনো বন্ধু-বান্ধবও নেই যে আমার জন্যে তাঁদের এতো মাথাব্যথা হবে।'

'কিন্তু আত্মীয়-স্বজন?'

'এখন আর আমার কোনো আত্মীয়-স্বজনও নেই।'

'মিস্টার ফগ, আপনার জন্যে আমার বড়ো কষ্ট হচ্ছে। জীবনে একা,—দুঃখের অশ্রু মুছিয়ে দেবে এমন কেউ নেই, সে যে বড়ো ভয়ানক জীবন! লোকে কথায় বলে, দুঃখের বোঝা নেবার যদি অংশীদার থাকে, তবে সে বোঝা যতই ভারি হোক না কেন, অনায়াসে ঘাড়ে নিতে পারা যায়।' 'আউদা চেয়ার থেকে উঠে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন ফগের দিকে। 'আমি যদি আপনার দুঃখের বোঝার অংশীদার হ'তে চাই তবে কি আপনার আপত্তি আছে? আপনি কি আমায় আপনার স্ত্রীর সম্মান দেবেন?'

ফগও তখন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। ঠোঁট কাঁপতে

লাগলো তাঁর। চোখ হ'য়ে উঠলো উজ্জ্বল। ফগ ডেকে উঠলেন, 'পাসপার্তুত'!

পাসপার্তুত ঘরে ঢুকে যখন দেখলো ফগ আউদার নরম হাত ধ'রে আছেন, তখন সব-কিছুই বুঝতে আর দেরি হ'লো না। ফগ বললেন: 'গির্জের বিশপকে এক্ষুনি বিয়ের খবর দিতে হবে পাসপার্তুত। এখনো রাত বেশি হয়নি।'

পাসপার্তুত খুশি গলায় বললে: 'এ-খবরের আবার সময় অসময় কী? কাল সোমবার। কালই কি বিয়ে হবে?'

ফগ আউদার দিকে তাকালেন। সলজ্জ কণ্ঠে আউদা বললেন: 'তাই হোক।'

সব ভালো তার শেষ ভালো যার — চোদ্দ

এডিনবরায় যেদিন আসল চোর ধরা প'ড়লো, সেদিন হ'লো সতেরোই ডিসেম্বর। তখন আবার একটা হৈ-চৈ প'ড়ে গেলো। এতোদিন ফগ একটা সাধারণ দস্যু হিশেবে পরিচিত হয়েছিলেন, এক মুহূর্তে সেই কলঙ্ক হ'লো অপসৃত। তখন আবার লোকের মুখে-মুখে ফিরতে লাগলো ফিলিয়াস ফগের নাম। আবার আশি দিনে পৃথিবী ঘোরা নিয়ে ধরা হ'তে লাগলো বাজি। হুজুগে সব খবরের কাগজগুলো ফের ফগের সম্পর্কে প্রত্যেক দিন আলোচনা করতে লাগলো।

শনিবার, একুশে ডিসেম্বর, সন্ধ্যা হ'তে-না-হ'তেই রিফর্ম ক্লাবের আশ-পাশ লোকে লোকারণ্য হ'য়ে গেলো। সকলের মুখে এক কথা: 'আজ ফিলিয়াস ফগের আসবার দিন।' রাস্তায়-ঘাটে এতো হ'লো যে যানবাহন সমস্তই গেলো বন্ধ হ'য়ে। পুলিশ এসে

চারদিকে কড়া পাহারা বসালো, যাতে কোনো গোলযোগ না হয়।

রিফর্ম ক্লাবের সভ্যরা বিকেলবেলাতেই ক্লাব-ঘরে এসে হাজির হয়েছিলেন। আটটা বেজে কুড়ি মিনিটের সময় আঁদ্রে স্টুয়ার্ট বললেন : আর পঁচিশ মিনিট বাদেই অতিক্রান্ত হবে নির্দিষ্ট সময়। কই, মিস্টার ফগ তো এলেন না এখনো!'

ফ্ল্যানাগেন শুধোলেন : 'লিভারপুলের শেষ ট্রেন ক-টায় লণ্ডনে আসে?'

র‍্যালফ বললেন : 'সাতটা তেইশ মিনিটে। তার পরের ট্রেন রাত্রি বারোটার আগে আসে না।'

স্টুআর্ট তখন বলতে লাগলেন : 'তাহ'লেই দেখুন, ফগ যদি সেই সাতটা তেইশের ট্রেনেই আসতেন, তাহ'লে এতোক্ষণে আমরা তাঁকে নিশ্চয়ই এখানে পেতুম। কাজেই বাজিটা আমারই জিত।'

ফলেস্টিন বললেন : 'অতো ব্যস্ত হবেন না। মিস্টার ফগের রীতি-নীতি তো জানাই আছে আপনাদের। তাঁর মাথাটা সব সময় তেমন ঠিক থাকে না বটে, কিন্তু তিনি যে সব কাজ ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায় করেন সেটা তো আপনারা জানেন। তিনি যদি ঠিক শেষ মুহূর্তেও এসে হাজির হন, আমি একটুও অবাক হবো না।'

ফ্ল্যানাগেন বললেন : 'ওঁর প্রস্তাবটাই তো একটা পাগলামো। যতোই তিনি ঘড়ির কাঁটা ধ'রে কাজ করুন না কেন, পথে বেরোলেই কোনো-না-কোনো কারণে দু-একদিন দেরি হবেই। তাহ'লেই তো মিস্টার ফগের সব বন্দোবস্ত উল্টে যাবে!'

র‍্যালফ বললেন : 'তবে আর কী! কালই বারিংএর গদি থেকে মিস্টার ফগের টাকাগুলো আনা যাক।'

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে স্টুআর্ট বললেন : 'আর পাঁচ মিনিট!'

ফলেস্টিন বললেন : 'আর কেন? জয় তো আমদেরই হ'লো, আসুন এখন খেলা যাক। ঐ দেখুন, পাঁচ মিনিটের দু-মিনিট গেলো।'

তাঁরা খেলবার জন্যে তাস তুলে নিলেন। কিন্তু দেয়ালের ঘড়ি

থেকে চোখ কিছুতেই ফিরতে চাইলো না। তাঁরা জানতেন যে বাজিতে তাঁরাই জিতবেন, তবুও সময় যেন আর যেতে চাইছিলো না। তাস শাফল করতে-করতে র‍্যালফ বললেন : 'আর দু-মিনিট !'

হঠাৎ বাইরের বিপুল লোকারণ্য থেকে সাংঘাতিক হট্টগোল শুরু হ'লো। চমকে উঠলেন সবাই, শুধু কাঁপা গলায় সলিভান বললেন : 'আর এক মিনিট !'

এক···দুই···তিন···চার···পাঁচ···ত্রিশ সেকেণ্ড গেলো। ফিলিয়াস ফগ এলেন না। চল্লিশ গেলো, পঞ্চাশ সেকেণ্ড গেলো, তখনও এলেন না ফগ। আর মাত্র দশ সেকেণ্ড! ফ্লানাগেন গুনতে লাগলেন : এক···দুই···তিন···চার··· ।'

বাইরের হৈ-চৈ তুমুল হ'য়ে উঠলো। অতো হৈ-চৈ কেন ?

'পাঁচ···ছয়···সাত'···

ফ্ল্যানাগেন আট বলবার আগেই হঠাৎ খুলে গেলো ক্লাব-ঘরের দরজা। উত্তেজিত জনতার আগে-আগে বিজয় গর্বে ঘরে ঢুকলেন ফিনিয়াস ফগ। সবাইকে হাসিমুখে নমস্কার জানিয়ে উদাত্ত গলায় বললেন : 'আমি এসেছি।'

* * *

তবে কি সত্যিই এলেন ফগ ? সকলে সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখলেন, সত্যিই ফিলিয়াস ফগ এসেছেন।

পাঠকের বোধহয় মনে আছে, সেদিন রাত্রি আটটা পাঁচ মিনিটের সময় পাসপার্তু বিয়ের বন্দোবস্ত করবার জন্যে বিশপের কাছে গিয়েছিলো। বিশপের ওখানে গিয়ে মিনিট পনেরো তাকে ব'সে থাকতে হ'লো শুধু-শুধু, কারণ বিশপ তখন বাইরে গিয়েছিলেন।

আটটা পঁয়ত্রিশ মিনিটের সময় উন্মাদের মতো বিশপের বাড়ি থেকে বেরোলো পাসপার্তু। দৌড়—দৌড়—দৌড়! প্রাণপণে দৌড়োচ্ছিলো সে। তিন মিনিটের মধ্যে বাড়ি এসে পৌঁছুলো।

রুদ্ধকণ্ঠে ফগকে বললে : 'কাল বিয়ে হ'তে পারে না!'

'কেন?'

'কাল রোববার!'

'না,—সোমবার।'

আজ শনিবার! আপনার ভুল হয়েছে! আমরা ঠিক সময়ের চব্বিশ ঘণ্টা আগে পৌঁছেছি! আর দশ মিনিট সময় আছে। আপনি চলুন!' আর কোনো কথা না ব'লে ফগকে টানতে-টানতে রাস্তায় নিয়ে গেলো সে। একটা ট্যাক্সিতে উঠে ড্রাইভারকে বললে : 'রিফর্ম ক্লাব। জলদি! হাজার টাকা বখশিশ!'

*　　　*　　　*

ফগের এরকম ভুল কেন হয়েছিলো? দিন গুনতেই কি ভুল করেছিলেন? এর জবাব খুব সোজা। নিজের অজান্তে ফগ অল্প-অল্প ক'রে চব্বিশ ঘণ্টা সময় অগ্রবর্তী হয়েছিলেন। লণ্ডন থেকে যাত্রা করা অবধি বরাবর তিনি পুবদিকে আসছিলেন, কাজেই মোটের উপর এক দিন বেড়েছিলো। যদি পশ্চিম থেকে চলতেন তবে তাঁকে এক দিন পিছিয়ে পড়তে হ'তো। বরাবর পুব দিকে যাচ্ছিলেন ব'লে প্রত্যেক ডিগ্রিতে দিন চার মিনিট ক'রে ছোটো হচ্ছিলো। সুতরাং তিনশো ষাট ডিগ্রিতে মোটের উপর চব্বিশ ঘণ্টা ছোটো হয়েছিলো,—ফগ তাই চব্বিশ ঘণ্টা অগ্রবর্তী হয়েছিলেন।

আরো পরিষ্কার ক'রে বলতে গেলে বলতে হয়, ফগ পুব দিকে এগোতে-এগোতে আশি বার সূর্যকে দেখেছিলেন মাথার উপর, আর ঠিক সেইটুকু সময়ের মধ্যেই তাঁর বন্ধুরা লণ্ডনে ব'সে দেখেছিলেন উনআশি বার। এতেই একদিনের গণ্ডগোল হয়েছিলো।

সেই আশ্চর্য বাজির কাহিনী তাই এবারে শেষ ক'রতে হয়। কারণ ফিলিয়াস ফগের গলায় এখন দুলছে জয়মাল্য,—ফগ বাজি জিতেছেন। সঙ্গে-সঙ্গে বাজির গল্পও তো শেষ হ'য়ে যেতে বাধ্য। নয়-কি?